

سَمْوَاتُ الرَّحْمَنِ



জানুয়ারি । ১০২১

উষার রক্তিম উষ্ণ অভ্যর্থনায়
আলোর পাথিরা জাগবে,
মিনারে মিনারে তাওহীদের জয়গান
ফেলে আসা সোণালী ইতিহাস আবার ফিরবে..



ই

সলাম নিছক কোনো ধর্ম নয়। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন। ইসলামই সত্য আর বাকি সব বাতিলা আল্লাহ সুবহানাত্ত ওয়া তা'আলা এই দ্বীনকে সম্মানিত করেছেন। এই দ্বীন যে মানবে আল্লাহ সুবহানাত্ত ওয়া তা'আলা তাকেও সম্মানিত করবেন।

আমাদের পূর্ববর্তীরা এই দ্বীনের কাছে সঁপে দিয়েছিলেন নিজেদের। এই দ্বীনের জন্যেই বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেদের। বরিষ্যেছেন চোখের পানি, শরীরের ঘাস, বক্ত। আল্লাহ সুবহানাত্ত ওয়া তা'আলা এই দ্বীনের মাধ্যমেই তাদের সম্মানিত করেছেন।

কিন্তু শংস্য! কি নিদারুণ আত্মপরিচয় সংকটে ভুগছি আমরা। নিজেদের সোনালী অঙ্গীতের কথা জানিই না অনেকে। অথচ এই আমরাই আজ তাদের কাছেই সজ্ঞাতা শিখাতে যাচ্ছি যারা ছিল অসজ্ঞ। অথচ এই দুনিয়ার তথাকথিত রোলমডেল কাফির-মুশরিকরা কখনেই সজ্ঞ ছিল না। আল্লাহর জমিনে সজ্ঞাতার আবির্ভাবই তো ঘটিয়েছে এই দ্বীন।

আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে সেই দ্বীন, যেই দ্বীন মহান, যেই দ্বীন আল্লাহর তবেই পৃথিবীর বুকে আমরা হবো সম্মানিত। উম্মার ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন—

“আমরা হচ্ছি সেই জাতি যাদের আল্লাহ তা'আলা ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, আমরা যদি ইসলাম ক্ষতীত অভ্য কেন্দ্রে উপায়ে সম্মান থেক্সি তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের লাক্ষ্মি করবেন।”

আমাদের নতুন প্রজন্মকে তাদের আসল পরিচয় মনে করিয়ে দিতে, সোনালী অঙ্গীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তাই এবারের মূল আয়োজন থাকছে মুসলিম উম্মাহর কতিপয় বীর সেনানীদের নিয়ে।

- টিম ষালো

যা যা থাকছে এইবার:

- কেন তারা ঝোর যায়!
- সংশয়ের মুখামুখি
- আপনাকে ভালোবাসি হে আল্লাহর বাসুল 
- জীবনের উদ্দিষ্ট কী?
- সুইট সিক্রিটিন
- আমরা যাঁদের উত্তরসূরী
- উক্তিরথানা : কুয়াশার চাদর
- সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স : দ্য প্যান্থার
- থুলি মেঘের ডাঁজ
- মুনশী মেহেরুল্লাহ
- জাগ্নাত খেজুর বাগান কেনার গল্প
- অঙ্গীম যাত্রার প্রথম সোপানের সাথে পরিচয়
- প্লাস্টিকের রাজতৃ
- কাপড় ব্যবসায়ী থেকে যুগান্বিত আলিম!
- ফেসবুক ডট ডেথ
- আম-মালাতু খাইফ্রম মিনান নাওম
- প-তে প্রোগ্রামিং, প-তে পাইথন


মুক্ত বাতাসের ঝোঁজে





কেন তারা ঘরে যায় !

- মুহাম্মদ এনামুল হোসাইন

বছর দশেক আগের এক দুপুর। তরুণ
বয়স। চোখে সমাজ বদলানোর
রাজ্যের নেশা। ল্যাব থেকে ফিরছি। বহুদূর
হেঁটে এসে শরীর কিছুটা ক্লান্ত। আইসক্রিম
থেতে ইচ্ছে হলো। এরকম মাঝে মাঝেই
থেতে ইচ্ছে হতো। বাবা কখনো টাকার
কষ্ট দেননি। টাকা নিয়ে কখনো কেনো
ক্রপণতা করেননি। বাবার পাঠানো টাকা
খরচ করতে ইচ্ছে করতোনা তারপরেও।
সেদিন আইসক্রিম খাবার ইচ্ছের কাছে
'বাবার ভালো ছেলে' হয়ে থাকার বাসনা
হার মানলো।

দোকানে গেলাম আইসক্রিম থেতে। পিচ্ছি
একটা মেয়ে বাবার কোলে চড়ে দোকানে
এসেছে। লোকটাকে চিনতে পারলাম,
আমাদের কলেজের দারোয়ান। মেয়েটা
চিপসের প্যাকেট দেখিয়ে বারবার করে
কিনে দিতে বলছিল। দারোয়ান মামা 'এটা
পঁচা, এটা খেলে পেট ব্যাথা করবে'
ইত্যাদি বলে পিচ্ছি বাবুটাকে বুঝ দিচ্ছিল।
অভাবগ্রস্ত অসহায় এক পিতার এই ব্যর্থ
অভিনয় আমার তরুণবুকে ঝড় তুলে দিল।
মনে হলো, দোকানের সব চিপস কিনে
পিচ্ছিটার হাতে দিয়ে দেই। সাধ্যে কুলালো
না। চুপচাপ ঘরে ফিরলাম।

এরকম আরো বেশ কয়েকবার হয়েছে।
কখনো দেখেছি বৃদ্ধা ভিখারী ফলওয়ালার
দোকানে গিয়ে কাকুতি মিনতি করছে, তার
খুব করে কমলা খেতে ইচ্ছে করছে। একটা
পঁচা কমলা যেন তাকে দেয় দোকানী।
ফলওয়ালা খেই খেই করে তাড়িয়ে দিয়েছে
বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধা চোখের জল আড়াল
করেছেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমি চুপচাপ
দাঁড়িয়ে দেখেছি দূরে।

এরকম আরও কতবার হয়েছে। চলন্ত
বাসের জানালা, রিকশা বা ফুটপাতের
এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন বিকেলে জীবনের
কত রঙ চোখে পড়েছে। বেশিরভাগই ভুলে
গিয়েছি। অল্প কিছুই মনে আছে।
ভাস্টিতে থাকতে মাঝে মাঝে মনে হতো।
খারাপ লাগতো। আবেগের তীব্রতা এরপর
কমতে শুরু করেছে। নানান ঝামেলায়
ভুলতে শুরু করলাম। এখন মাঝে মাঝে
মনে হলেও বুকে আর তোলপাড় করে না।
বিপ্লবের পথে নামার, পৃথিবীটাকে বদলে
দেবার ইচ্ছেটা আলু-পটল-তেলাপিয়া
মাছের বাজারের লিস্টে এসে থেমে গেছে।

এ অবস্থা আমার না। আরো অনেকেরই।
আমরা যারা প্রথম তারুণ্যে একসাথে

ধীনের পথে হাঁটতে শুরু করেছিলাম, তাঁদের অনেকেরই অবস্থা আমার মতই করুণ। বিপ্লবের নেশা রাতে ঘুমুতে দেয় না—এমনটা আর এখন হয়না।

প্রিয় ভাই আমার, তোমার এখন যা বয়স তাতে হয়ত আমার কথা মেনে নিতে তোমার কষ্ট হতে পারে। তুমি ভাবতে পারো, সবার সাথে এমন হলেও আমার সাথে এমন হবে না। আমি এভাবে বদলে যাব না। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য এখন যেমন দৃঢ় সংকল্পবন্ধ হয়েছি, ঠিক তেমনি থাকব আমি। কখনো বদলাবো না। কাশগড়, কাশ্মীর, আরাকান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষের চোখের জল মুছে তবেই ক্ষান্ত হব আমি। দুনিয়ার লোভ-লালসা, দুঃখ-কষ্ট, আরাম-আয়েশ, যশ-খ্যাতি কোনোকিছুই আমাকে টলাতে পারবে না। দুনিয়ার বাতাসে আমি কখনো ঝারে যাব না।

বিশ্বাস করো ভাই, এরকম আমিও ভেবেছিলাম। ভেবেছিল আমার সব বন্ধুরা। কিন্তু, পৃথিবীর পথে পথে চলতে গিয়ে প্রথম তারঁগে নেওয়া সেই বজ্র কঠিন শপথে টিকে থাকাটা আর সন্তুষ্ট হয়ে উঠছে না। বারবার পদস্থলন হচ্ছে।

এসব কথা বলে আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাচ্ছি না। তোমাকে নিরুৎসাহিত করারও চেষ্টা করছি না। শুধু বাস্তবতার একটা অংশ বোঝানোর চেষ্টা করছি। বড় ভাই হিসেবে সাবধান করে দেবার চেষ্টাকরছি আগামী জীবনের সন্তাব্য ভুল সম্পর্কে। তোমাদের এখনকার বয়সটা আবেগের বয়স। এখন অনেক কিছু সন্তুষ্ট মনে হলেও পরে অনেক কিছুই অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে তোমার।

আমরা কেন নির্যাতিত উমাহকে সাহায্য করতে চাই? এই প্রশ্নের উত্তরে শুরুতেই আসে আবেগ। মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের কোনো ভিড়ও দেখলাম, ব্যাস মাথায় আগুন লেগে গেল! সবকিছু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হল। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আবেগ অনেক জরুরী ভাই। আবেগ ছাড়া, ঈমানী জ্যবা ছাড়া এপথে চলা অনেক কঠিন। কিন্তু আবেগ যেন আমাদের মূল চালিকাশক্তি না হয়। এমন হলে বাস্তবতার কাছে সহজেই পরাজিত হবার সন্তাবনা থাকে।

আবেগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথায় গেঁথে নিতে হবে, আমরা নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াব কারণ—

১. আল্লাহ কুরআনে আমাদের তা করার নির্দেশ দিয়েছেন,
২. রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীরা একজন মুসলিম নারীর সম্মান রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন,
৩. শারিয়াহ অনুযায়ী দুনিয়ার সব সম্পদের বিনিময়ে হলেও কাফির-মুরতাদদের হাতে বন্দী একজন মুসলিমকে মুক্ত করতে হবে,
৪. একজন মুসলিমের রক্ত আল্লাহর কাছে কা'বার চাইতেও প্রিয়।

ভাই আমার, এই উত্তরগুলো তোমার মন্তিক্ষে গেঁথে নাও। আত্মস্থ করে নাও। মাঝে মাঝে এগুলো নিয়ে চিন্তা করবে। যদি তুমি এই কথাগুলো হৃদয়ে ধারণ করতে পারো, তাহলে ইনশাআল্লাহ দুনিয়াবি ব্যস্ততাগুলো চলে আসলেও বিপ্লবের পথ থেকে পদস্থলন হবার সন্তাবনা অনেকাংশেই কমে যাবে। আবেগ অবশ্যই থাকবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আকলকেও কাজে লাগাতে হবে।

সংশয়ের মুখোমুখি

-রহমতুল্লাহ সজল



একটা কথা কী জানো? মানুষের অন্তরটা খুব বেশি পরিবর্তনশীল। একটু পরপরই এর অবস্থা বদলায়। এজন্যেই দেখা যায়, সকালে আমাদের ঈমানের অবস্থা একরকম থাকে আবার বিকেলেই সেটার অবস্থা হয়ে যায় পুরোপুরি উল্টো। এ নিয়ে নবিজি সা. এর চমৎকার একটি হাদীসও রয়েছে। তিনি বলেন - ‘অন্তর হলো (পাখির) পালকতুল্য, খোলা ময়দানের বাতাস যেটাকে এদিক সেদিক নিয়ে যায়।’[1]

অন্তরের অবস্থা যেহেতু পরিবর্তনশীল তাই ফিতনাগুলো প্রাথমিকভাবে অন্তরে এসেই বাসা বাঁধে। এগুলো অন্তরে আস্তানা গেড়ে অন্তরে বিভিন্ন ধরণের সংশয়ের বীজ বুনতে চায়। এ নিয়ে নবিজি সা. অনেক আগেই আমাদের সতর্ক করে গিয়েছেন। তিনি বলেন - ‘চাটাইয়ের বুননের মতো একেক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায় তাতে একটি করে কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করে তাতে একটি উজ্জ্বল দাগ পড়ে। এমনি করে দুটি অন্তর দু'ধরণের হয়ে যায়।’[2]

এখানে লক্ষ্ণনীয় বিষয় হলো, নবিজি সা. বলেছেন ফিতনার পর ফিতনা আসতেই থাকবে। থামবেনা মোটেও। আজকে একটা ফিতনা ফেইস করবে তো কালকে আরেকটা। সবগুলোর সাথে তুমি পেরে উঠবে না। কিছু কিছু ফিতনা তোমার মনে সংশয় সৃষ্টি করে কালো দাগ রেখে যাবেই। ভয়ানক না ব্যাপারটা?

এর পাশাপাশি আরেকটা বিষয় আছে। সেটা হলো, আমাদের যুগও কিন্তু প্রতিনিয়ত পাল্টাচ্ছে। দিনকে দিন যুগের বিভিন্ন মতবাদ আমাদের সামনে আসছে, মানুষের বিশ্বাস পাল্টে যাচ্ছে। নবিজি সা. কিন্তু এই বিষয়টা আমাদের আগেই জানিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন - ‘শেষ জামানায় আমার উম্মতের একদল মানুষ আসবে, যারা তোমাদের এমন কিছু বলবে, যা তোমরা আগে শোনোনি। তোমাদের পূর্বপুরুষরাও শোনেনি। কাজেই নিজেদের ব্যাপারে এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও।’[3]

এই হাদীসের প্রতিফলন যেন আমাদের এই যুগে অনেক বেশি হারে ঘটছে। প্রতিনিয়ত ইসলাম নিয়ে আমাদের সামনে এমন এমন সংশয়মূলক কথা আসছে যেগুলোর অস্তিত্ব হয়তো আজ থেকে ৫০ বছর আগেও ছিল না। এগুলো আমরা শুনি আর সংশয়ে পড়ে যাই, আমাদের ঈমান হয়ে যায় দুর্বল, ইবাদতের স্বাদ হারিয়ে যায়। এককথায়, আমাদের বিশুদ্ধ অন্তরটা কুলষ্টি হয়ে যায়।

অপরদিকে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা হলো - ‘সেদিন শুধু সে উপকৃত হবে, যে আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আসবে।’[4]

তো বোঝা গেলো, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে আমাদের একেবারে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। নইলে উপায় নেই। তবে, এইয়ে আমাদের চারপাশে এত ফিতনা; যেগুলোর কারণে আমাদের অন্তরে বিভিন্ন ধরণের সংশয় এসে ভর করে এগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? অন্তর সংশয়ের মুখোমুখি হলে আমরা কীভাবে লড়বো? নিচের আলোচনায় তোমাকে এগুলো নিয়েই কিছু সোজাসাপ্টা পরামর্শ দিবো।

মোট দশটি মূলনীতি আমি তোমাদের সামনে উল্লেখ করবো। এরমধ্যে প্রথম ছয়টিতে থাকবে অন্তরে সংশয় প্রবেশের পূর্বের কাজ নিয়ে আলোচনা; যা তোমাকে সংশয় থেকে বঁচিয়ে রাখবে এবং পরের চারটিতে থাকবে, অন্তর সংশয়ে আক্রান্ত হয়ে গেলে কী করণীয় সেই সেই বিষয়ে আলোচনা। তো চলো, জেনে নেওয়া যাক সেই মূলনীতিগুলো –

• অন্তরে সংশয় প্রবেশের পূর্বের কাজ:

১. সতর্ক থাকো:

তোমাকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে বিভিন্ন ধরণের ফিতনা তোমার অন্তরে সংশয় জাগাবে। এ সম্পর্কে মোটেই গাফেল হবে না। নিফাক, কুফর, শিরক থেকে আল্লাহর কাছে সবসময় আশ্রয় চাইবে। আর যদি এসব নিয়ে সতর্ক থাকার ব্যাপারটাকে তোমার খুব হালকা মনে হয় তাহলে তাবিয়ি ইবনু আবি মুলাইকা রাহি। এর কথা শুনো। তিনি বলেন: ‘আমি নবিজির সা. সাহাবাদের মধ্যে অন্তত ত্রিশজনের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের ব্যাপারে নিফাকের (মুনাফিক হয়ে যাওয়ার) ভয় করতেন’[5] সুবহানাল্লাহ! এর থেকেই আমাদের বোঝার কথা যে, কেনো আমাদের ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যিক।

২. সংশয়বাদীদের সাথে মিশবে না:

যারা সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বেশি কথা বলে তাদের সাথে মোটেও মিশবে না। তাদের গল্পের আসরে বসবে না। তাদের কোনো লেখা পড়বে না। তাদের ভিডিও কন্টেন্টগুলো দেখবে না। তবে, এটা কখনো ভাববে না যে, সংশয়গুলো শক্তিশালী আর ইসলাম দুর্বল। বরং, আমাদের অন্তরই দুর্বল। এটাই ছিল আমাদের সিংহভাগ সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁদের সামনে কেউ সংশয়পূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করলে তাঁরা কানে আঙুল চুকিয়ে দিতেন এবং সাধ্য হলে, সেই স্থান ছেড়ে চলে যেতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, অন্তরই আসলে দুর্বল আর সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলো একে সহজেই ধ্বংস করে দিতে পারে।

৩. নেককার বন্ধুদের সংস্পর্শে থাকো:

এটা জানা কথা যে, মানুষ তার আশেপাশের লোকেদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। একটা মানুষ যতই খারাপ থাকুক, সে যদি ভালো মানুষদের সাথে সময় কাটায় তাহলে অবশ্যই সে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে। আবার, একটা মানুষ যতই ভালো হোক না কেনো, সে যদি খারাপ মানুষদের সাথে বেশি সময় কাটায় তাহলেও সে ঐ মানুষগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। কাজেই, বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবে। সবসময় নেককার বন্ধুদের সাথে ওঠাবসা করবে। নবিজি সা. এর এই হাদীসটি সর্বদা মনে রাখবে। তিনি বলেন: ‘যদি তার বন্ধুর দ্বীনের ওপর থাকে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই যেন খেয়াল করে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব গড়ছে।’[6]

৪. ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করা:

এই পয়েন্টের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, শুধুমাত্র জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অনেক দুর্বল কিছু সংশয়ও অন্তরের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু, জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে যখন একই সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলো তোমার সামনে পড়বে, তখন এগুলোকে তোমার পানির চেয়েও সহজ মনে হবে। তুমি এগুলোকে হেসে উড়িয়ে দিবে না। তো, পার্থক্যটা বুঝতে পারছো? পার্থক্যটা হলো, ইলম বা জ্ঞান। কাজেই, সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলো থেকে নিজের ইমানকে বাঁচাতে আমাদের ইসলাম সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে। প্রাথমিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমি তোমাকে দুইটি বই আগাগোড়া পড়ে ফেলার অনুরোধ করবো: ১. ইসলামি জীবনব্যবস্থা - মুফতি তারেকুজ্জামান, রহমামা পাবলিকেশন। ২. ইসলামকে জানতে হলে - মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ, দারুল কলম প্রকাশনী।

৫. মাসনূন যিকিরগুলো দৈনিক মেইনটেইন করো:

দেখো, আমরা দৈনন্দিন যেই মাসনূন যিকির-আয়কারগুলো করি সেগুলো আমাদের অন্তরে শিল্পের মতো কাজ করে। এগুলো নিয়মিত না করলে সেই শিল্প দুর্বল হয়ে যায়। ফলে সংশয়গুলো খুব সহজেই অন্তরকে পাকড়াও করতে পারে। কাজেই, দৈনন্দিন মাসনূন যিকিরগুলো মেইনটেইন করতে মোটেও ভুলবে না। বিশেষ করে, সকাল-সন্ধ্যার যিকিরগুলো। এখন, দৈনন্দিন মাসনূন যিকিরগুলো কোথায় পাবে তাই ভাবছো তো? তাহলে তোমাকে মাসনূন যিকির বিষয়ক দুইটা বই রেকমেন্ড করি। ১. রাহে বেলায়াত - ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহ্মান, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন। ২. বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া - সাঈদ ইবনে আলী আল কাহতানী, মাকতাবাতুল বায়ান।

৬. নিজেকে কোনো প্রোডাক্টিভ কাজে ব্যস্ত রাখো:

আমরা যখন নিজেদেরকে প্রোডাক্টিভ কোনো কাজে ব্যস্ত রাখি তখন শয়তান আমাদের খুব কমই ওয়াসওয়াসা দেওয়ার সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে আমরা যখন অবসর সময় কাটাই তখন শয়তান তার সর্বোচ্চটা দিয়ে আমাদের ওয়াসওয়াসা দিতে শুরু করে। আর কোনো কাজে ব্যস্ত না থাকায় আমরাও সেগুলো নিয়ে ভাবতে থাকি যার ফলে সংশয়গুলো অন্তরে খুব ভালোভাবে জেঁকে বসার সুযোগ পায়। কাজেই, খুব বেশি সময় অবসরে কাটাবে না। নিজেকে কোনো একটা প্রোডাক্টিভ কাজে ব্যস্ত রাখো। আর কীভাবে একজন প্রোডাক্টিভ মুসলিম হয়ে উঠবে সেই ব্যাপারে জানতে দুটি বইয়ের সন্ধান দিচ্ছি। ১. আদর্শ মুসলিম - ড. মুহাম্মাদ আলী আল হাশেমী, রুহামা পাবলিকেশন। ২. উচ্চ মনোবল - শাহখ ইসমাইল আল মুকাদ্দাম, রুহামা পাবলিকেশন।

• অন্তরে সংশয় প্রবেশের পরের কাজ:

উপরে আমরা আলোচনা করেছি অন্তরে সংশয় প্রবেশের পূর্বের কাজগুলো নিয়ে। কিন্তু, যার অন্তরে অলরেডি সংশয়গুলো বাসা বেঁধেছে সে কী করবে? সেগুলো নিয়ে আমরা নিচের পয়েন্টগুলোতে আলোচনা করবো –

১. মন্দ চিন্তাকে অন্তরে জায়গা দিবে না:

মন্দ চিন্তাগুলোকে মোটেও অন্তরে জেঁকে বসতে দিবে না। ভাববে, এটা পুরোপুরি শয়তানের ওয়াসওয়াসা। চিন্তাগুলো আসার সাথে সাথে "আউয়ুবিল্লাহি মিনাশ শাহিত্বনির রজীম" পড়ে ফেলো।[7] চিন্তাগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করো। নবিজিও সা. আমাদের এমনটাই করতে বলেছেন। তিনি বলেন: 'শয়তান তোমাদের কারও কারও (চিন্তায়) এসে বলে, 'এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে?' এভাবে এক সময় সে বলে, 'তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে?' যখন কোনো ব্যক্তি এমন অবস্থায় উপনীত হয় তখন সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং চিন্তাগুলোকে ঝেঁড়ে ফেলে।'[8]

২. হয়ে উঠো সত্যানুসন্ধানী:

যেকোনো জিনিসকে যাচাই করতে শিখো। কোনো কিছু শোনামাত্রই বা দেখামাত্রই সেটাকে ধ্রুব সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিবে না। একটু অনুসন্ধান চালাও। আশর্যের বিষয় হলো, অনেক ভাই-বোনকে দেখা যায়, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে দু-একটা বক্তব্য শুনেই বা কোনো আর্টিকেল দেখেই বলে বসে 'আহা! আমার ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে। আমি ঈমান হারিয়ে

ফেলেছি' তখন আমি নিজেকে নিজেই বলি, 'লাইক সিরিয়াসলি?' মানে, যেই দ্বীনকে আমি শাশ্বত দ্বীন মনে করি সেই দ্বীনকে নিয়ে কোথাকার কে দু'কথা বললো তাতেই আমার ঈমান দুর্বল হয়ে গেলো? সেই 'কোথাকার কে'র কথাটা কতটুকু সত্য সেটা নিয়ে একটু অনুসন্ধানও করবো না আমি? এটা কখনোই মেনে নেয়ার মতো না। তাই বলছি, অনুসন্ধানী হয়ে উঠো। সংশয়বাদীদের লেখা পড়েই 'ঈমান হারিয়ে ফেলাম' বলে বসে থাকবে না। তাদের বিরুদ্ধে ইসলামি ঘরানার লেখকেরা যা লিখেছেন সেগুলোও পড়ো। তবে শর্ত হলো, পড়ার সময় একটা খোলা মন নিয়ে পড়তে হবে এবং আল্লাহর কাছে বারবার সাহায্য চাইতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ সংশয়গুলো দূর হয়ে যাবে।

৩. যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো আলিমের শরণাপন্ন হও:

তোমার সংশয়ের বিষয়টা তোমাকে ভালোভাবে বোঝাতে পারবে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো আলিমের সাথে কথা বলো। যোগ্যতাসম্পন্ন আলিম বলতে তোমার বাসার পাশের মাসজিদের ঈমামকে ধরে নিও না। হতে পারে তার কুরআনের হিফজ ভালো, কঠ ভালো, ফিকহের দক্ষতাও রাখেন কিন্তু তোমার মনে যেই সংশয় রয়েছে সেই বিষয়ে হয়তো উনার পড়ালেখা নেই। কাজেই, উনার কাছে প্রশ্ন করার পর উনি যদি তোমাকে সন্তোষজনক কোনো উত্তর দিতে না পারেন তাহলে এটা ভাববে না যে, এই প্রশ্নের উত্তর-ই নেই। একটা মূলনীতি মনে রাখবে সবসময় - 'কোনো বিষয়ে কারও জ্ঞান না থাকার মানে এটা নয় যে ওই বিষয়ে জ্ঞানই নেই'। কাজেই, বিজ্ঞ কোনো আলিমের শরণাপন্ন হও। সাধ্য থাকলে হাতু গেড়ে তার সামনে বসো। আর যদি সেই সুযোগ না থাকে তাহলে তোমাকে অনুরোধ করবো, ইউটিউব থেকে ডাঃ জাকির নায়েক, হামজা জর্জিস, মোহাম্মদ হিজাব এদের লেকচারগুলো থেকে নিজের সংশয়গুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো। ইংরেজি জানা না থাকলে গুগল প্লে-স্টের থেকে 'ইসলামবিরোধীদের জবাব' অ্যাপটি ডাউনলোড করে নাও। সেখান থেকে তোমার সংশয়গুলোর উত্তর খুঁজো। ইনশাআল্লাহ তুমি তোমার কাঞ্জিত জবাব পেয়ে যাবে।

৪. মাবুদ গো! ঈমান নিয়ে যেন বাঁচতে পারি...

সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেই বিষয় সেটা হলো, আল্লাহর কাছে ঈমান নিয়ে বাঁচতে পারার তাওফিক চাওয়া। আমরা দু'আর মধ্যে আসলে কি চাই? গুনাহের জন্য ক্ষমা, দ্বীনদার জীবনসঙ্গী, সম্পদ, দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ আরো অনেক কিছু। কিন্তু, শেষ কবে আল্লাহর কাছে নিজের ঈমানকে রক্ষা করার কথা বলেছিলে? অথচ এটাই সবচেয়ে জরুরি ছিল। কাজেই, এখন থেকে নিয়মিত আল্লাহর কাছে নিজের ঈমান রক্ষার জন্য দু'আ করবে। বিশেষ করে, দুইটি দু'আ একেবারে মুখ্যত করে ফেলো।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ بَدَيْتَنَا وَبِبَنَانَا مِنْ لُدْنِكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَبَّابُ ۚ ۱.

অর্থ - হে আমাদের রব! হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র করে দিবেন না এবং আমাদের আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা। [9]

يَا مُقْبَلَ الْقُلُوبِ تَبْتَقِيلِي عَلَى دِينِكِ ۖ ۲.

উচ্চারণ - ইয়া মুফল্লিবাল কুলূব ছাবিত ক্লবী 'আলা দীনিক।

অর্থ - হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর দৃঢ় রাখুন। [10]

এগুলো শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সালাতে পড়বে, সিজদায় কেঁদে কেঁদে পড়বে, আযান ও ইকামতরের মাঝখানের সময়টাতে পড়বে, ফরজ সালাতের পর পড়বে। এগুলো দু'আ কবুলের উত্তম সময়। ইনশাআল্লাহ, কার্যকরী ফলাফল পাবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, সংশয় বিষয়ে এই ছিল তোমাদের সমীপে এই গুনাহগার ভাইয়ের কিছু পরামর্শ। পরামর্শগুলো কেউ যদি তার জীবনে কাজে লাগিয়ে কোনো ফল পাও তাতেই আমার এই লেখাটি সার্থকতা পাবে।

সবশেষে, অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারীর কাছে আরজি, তিনি যেন আমাদের সকলকে তাঁর শাশ্ত দ্বীনকে মেনে চলার এবং সেই দ্বীনের ওপর থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করার তাওফিক দেন। আমীন। ওয়াল হামদু লিল্লাহি রবিল 'আলামীন।

• তথ্যসূত্র:

1. সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং-৮৮; সহীহ।
2. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৬৪
3. হাদীসাটি সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় এসেছে।
4. সূরা আশ-শুআরা : ৮৯
5. মুসাগ্রাফ আব্দুর রাজ্জাক, ২০০৯৯
6. সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং - ২৩৭৮; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং-৭৯৬৮; সহীহ।
7. সূরা ফুসসিলাত : ৩৬
8. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৪৩
9. সূরা আলি ইমরান : ৮
10. সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং-২১৪০

• লেখাটি লিখতে যা কিছুর সহযোগিতা নিয়েছি:

1. Dealing with doubts by Ali Hammuda (Youtube lecture)
2. Dealing with spiritual doubts by Hamza Tzortzis (Youtube lecture)
3. কল্বুন সালীম, মহিউদ্দিন রূপম। সমর্পণ প্রকাশন।
4. আল হাদিস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ।

ଆପନାକେ ଭାଲୋବାସି ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରାମୁଲ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ଆରମାନ ଆଦୁଲ୍ଲାହ ସାକିବ

ପୃଥିବୀର ଆଦି ଥିକେ ଏଥିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍
କତ ସଂଖ୍ୟକ ମାନୁଷେର ଜନ୍ମ ହେଯେଛେ? ବିଭିନ୍ନ
ସୂତ୍ର ବଲଛେ ୧୦୭ ବିଲିଯନ! ତବେ ସଂଖ୍ୟାଟା ସେ
ମୋଟେও ଫ୍ରବକ ନୟ ଏଟା ସବାଇ ଏକବାକେ
ସ୍ଵିକାର କରବେନ। ଆବାର ପୃଥିବୀର ଶେଷ ହୋଯା
ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ କତ ସଂଖ୍ୟକ ମାନୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
କରବେ ସେଟାଓ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ବଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟବ ନୟ।

ଏହି ସେ ପୃଥିବୀର ଆଦି ଥିକେ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ହାଜାର ହାଜାର କୋଟି ମାନୁଷ, ଏତ ମାନୁଷେର
ମଧ୍ୟ ଥିକେ ସଦି ଆମାକେ ମାତ୍ର ଏକଜନ ପ୍ରିୟ
ମାନୁଷକେ ବେହେ ନିତେ ବଲା ହୟ; ତାହଲେ ଆମି
ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ୟ ଏକଜନ ମାନୁଷକେଇ ବେହେ ନେବା।
ସଦିଓ ଆମାର ଚୋଖ କଖନୋ ତାଙ୍କେ ଦେଖେନି,
ଆମାର କାନ କଖନୋ ତାଁର କର୍ତ୍ତ୍ସର ଶୁଣେନି।
କିନ୍ତୁ ହାଜାର କୋଟି ମାନୁଷେର ଭୀଡ଼େ ତାଁର ନାମ
ବଲତେ ଆମାର ଦ୍ଵିତୀୟବାର ଭାବବାର ପ୍ରଯୋଜନ
ହବେ ନା। ତିନି ହଲେନ ସାଡେ ଚୌଦଶ ବହର
ଆଗେ ମରନ୍ତର ବୁକେ ଜନ୍ମ ନେଇଯା ପୃଥିବୀର
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନୁଷ ମୁହାମ୍ମାଦ ପାତ୍ର। ଯାର ପ୍ରତିଟି କଥାଇ
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଦର୍ଶ, ଯାର ପ୍ରତିଟି ଦିକନିର୍ଦ୍ଦେଶନାଇ
ମୁକ୍ତିର ନିଶାନ।

ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ପାତ୍ର, ହେଚେନ ତିନି, ଯିନି ଆମାର
ଜନ୍ୟ ଗଭୀର ରାତେ ମହାନ ରବେର ନିକଟ
ଅଶ୍ରତସିନ୍ଧୁ କର୍ତ୍ତେ ଫରିଯାଦ କରେଛେ।
ପୃଥିବୀର ଲକ୍ଷ କୋଟି ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ମାନୁଷ, ମହାନ ରବେର ପରେଇ ଘାର ସ୍ଥାନ; ତିନି
ଆମାକେ ନା ଦେଖେଇ ‘ଭାଇ’ ବଲେ ସଞ୍ଚୋଧନ
କରେଛେ। ଏର ଥିକେ ଦୁନିଆତେ ଆମାର
ଜନ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପାଓୟା ଆର କୀ ହତେ ପାରେ!
ଆପନାକେ ଭାଲୋବାସି ଇଯା ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ
ପାତ୍ର। କିୟାମତେର କଠିନ ସଂକଟେଓ ଆପନି
‘ଇଯା ଉସ୍ମାତି, ଇଯା ଉସ୍ମାତି’ ବଲେ ସିଜଦାୟ
ଲୁଟିଯେ ପଡ଼ିବେନ। ଆପନାକେ ଭାଲୋବାସି ଇଯା
ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ପାତ୍ର, ଆପନାକେ ଆମାର ମା-ବାବା,
ଆମାର ଜୀବନେର ଚେଯେଓ ବେଶି ଭାଲୋବାସି
ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରାମୁଲ ପାତ୍ର,





জীবনের উদ্দেশ্য কী?

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

ভালো

যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় - কেন
পড়াশোনা কর?
উত্তর কেবল একটাই হবে - ভালো
রেজাল্টের আশায়।
- ভালো রেজাল্ট কেন চাও?
- ভালো ক্যারিয়ারের জন্য।
- আচ্ছা, ভালো ক্যারিয়ার কেন
দরকার?
- সুখে শান্তিতে থাকার জন্য ভালো
ক্যারিয়ার তো অত্যাবশ্যক।
আচ্ছা, তবে গোড়া থেকো শুরু করা
যাক। প্রতিদিন ভোরে ওঠে একগাদা
বইপুস্তক নিয়ে স্যারদের দুয়ারে দুয়ারে
ঘোরা। তারপর স্কুল। এরপর আবার

কোচিং। একরাশ ক্লান্তি নিয়ে সন্ধায়
বাড়ি ফেরার পর আবার বইয়ের মধ্যে
মুখ গুজে থাকা। আচ্ছা, ভালো
ক্যারিয়ার প্রস্তুতের জন্য তোমাকে
একটা ভালো চাকরি দেওয়া হলো।
ব্যাস, তুমি কি সুখী?
না, এবার শুরু হবে আরও বড় যুদ্ধ,
সহকর্মীদের সাথে প্রমোশন নিয়ে
লড়াই। এরপর প্রতিবেশির সাথে
বড়ত্বের লড়াই, সমাজের সাথে
প্রাচুর্যের লড়াই, যশ-খ্যাতি অর্জনের
লড়াই। নিজের সাথে নিজের লড়াই
(রাতের পর রাত চিন্তা করা—পার্থির
জীবনে কিভাবে আরও বেশি সম্পদ

লাভ করা যায়), সবার চেয়ে উচ্চতে ওঠার লড়াই। আচ্ছা, ধরো এগুলোর সবই তুমি পেলে। ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, খ্যাতি সব। তাহলে এখন কি তুমি সুখী?

এগুলো পেলেই মানুষ যদি সুখী হতে পারত তাহলে আজ বিল গেটস, স্টিভ জবস, মার্ক জাকারবার্গ এরা সবাই হতো সুখী মানুষ। কিন্তু এদের মতামত একদমই ভিন্ন কথা বলে। একবার এক ম্যাগাজিনে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও সফল ব্যক্তিদের ইন্টারভিউয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল ‘তারা সুখী কি না’। মজার ব্যাপার হলো, এদের কেউই বলেনি যে, তারা সুখী। তাহলে বুকা গেল, প্রাচুর্যের মাঝে সুখ বিরাজ করে না। তাহলে সুখ কোথায়?

দুনিয়াতে এত পরিশ্রম কেবল কয়েকদিন ভালোভাবে বসবাস করার জন্য। কিন্তু চিরস্থায়ী বাসস্থান জান্মাতে বসবাসের জন্য কতটুকই বা পরিশ্রম করছো? আদৌ করছো কি? সুখ হচ্ছে এমন মরীচিকা যা দূর থেকে আনুমান করা যায়, কাছে গেলে কিছুই পাওয়া যায় না। আবার সেখান থেকে মনে হয় আর একটু দূরে, কিন্তু আদৌ মেলে না সুখ নামক এই শব্দের দেখা। এভাবে ছুটতে ছুটতে একসময় ফুরিয়ে যায় আয়ু নামক বাঞ্ছের হাওয়া।

পার্থিব এই জীবন ইঁদুর-দৌড় ছাড়া কিছুই না। সামান্য প্রাচুর্যের লোভে, খ্যাতির লোভে, ক্ষমতার লোভে পড়ে ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়াকেই আমরা চিরস্থায়ী বাসস্থান ভেবে বসি। ভুলে যাই, আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাব। ভাবি, এসব নিয়ে চিন্তা করা মানে সময় ব্যয় ছাড়া কিছুই না। কি লাভ এত সম্পদের মালিক হয়ে, যদি তা আল্লাহর কাছে মূল্যহীন হয়? এত কষ্টে অর্জিত সম্পদ যদি কাজে না আসে? একটা উদাহরণ দিই। মনে করো, কিছু লোককে একটি বাজারের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলো। বলা হলো, ‘তোমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু মালামাল নিয়ে তোমরা চলে এসো।’ তন্মধ্যে কয়েকজন তাদের চাহিদা অনুযায়ী মালপত্র নিল এবং বাজার থেকে বের হয়ে নিজ নিজ বাড়ি গেল। কিন্তু বাকিরা তাদের চাহিদার অধিক মাল নিল এবং সেগুলো বহনে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা তা নিয়ে চললো। কিন্তু বাজার থেকে বের হওয়ার দরজা এতই ছোট ছিল যে, তারা ব্যাগসুন্দ বের হতে পারছিল না। অবশেষে তাদের বাড়ি ফিরতে হলো একরাশ হতাশা আর খালি হাত নিয়ে।

ঠিক তেমনি দুনিয়ার এই অল্প সময়ে বেশি পাওয়ার আকাঞ্চ্য পড়ে ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভুলে গেলে চলবেনা।

দুনিয়ার মোহে পড়ে গেলে তার
পরিণতি হবে উপরোক্ত হতাশাগ্রস্ত
ব্যক্তিদের মতো, যারা না পায়
ইহকাল, না পায় পরকাল। তাই পার্থিব
জীবনের মোহে মাতাল না হয়ে রবকে
দেওয়া প্রতিশ্রূতি পালনে মনোযোগী
হওয়াই উত্তম। কেননা, যারা প্রতিশ্রূতি
পালন করে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম
পুরস্কার (জান্নাত)।

মরীচিকার পেছনে না ছুটে ছুটতে হবে
আসল সুখের খৌঁজে যা কেবলই আল্লাহ
প্রদত্ত। আর সময় নষ্ট করা যাবে না।
হয়তোবা আর অল্প সময়ের মধ্যেই
নিঃশেষ হয়ে যাবে তোমার আয়ু নামক
বাঞ্ছের হাওয়া। তাই এখনই তাওবা
করো আর বেরিয়ে পড়ো তোমার
অঙ্গীকার পূরণের উদ্দেশ্যে। বেরিয়ে
পড়ো সুখের খৌঁজে, যা তোমার জন্য
সংরক্ষিত রয়েছে।

‘আমাদের মরল পথে পরিচালিত করো;
আদের পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ করোছ,
আদের পথে নয় যারা অভিশপ্ত ও পথপ্রদ্রষ্ট।’

[সূর্যা আল-ফাত্তিহা, ১: ৫-৭]

সুইট

সিক্রিটিন

পুরুষ সাজ প্রযোজন করেছেন



শৈ

শবের মসৃণ এবং নির্বাঙ্গাট সময়টা
অতিক্রম করে হঠাতে করেই তোমার জীবনে
'ঘোলো' নামে। এই 'ঘোলো' কে ধরে নিলাম
শৈশব থেকে বড় হওয়ার সফরে যেন সবে মাত্র
ট্রেনে চড়া, যার গন্তব্য এখনো অনেক দূর।

এই সময়টায় কিছু বুঝো ওঠার আগেই কত কিছু
যে হয়ে যায়! আমার যখন 'ঘোলো' ছিল, মনে
হতো বড়ই হয়ে গেলাম। সে এক অন্যরকম
ভাবসাব। স্বাধীনতাকে ধরার এক তীব্র ইচ্ছা।
মনে এক অন্যরকম ভালোলাগা। ঐ যে বলে না,
সুইট সিক্রিটিন! আসলেই সিক্রিটিন খুব সুইট।
সুইট সিক্রিটিনে সবকিছুই সুইট মনে হয়, শুধু
বাবা-মাকে মাঝে মাঝে বড় বিরক্তি লাগে!
এই সময়টাতে কত কিছু করতে ইচ্ছে করে।

রাত জাগতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পারা যায় না।
বাসার বাহিরে থাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু যেতে
দেয় না। হাতে খুব একটা টাকাও দেয় না বাসা
থেকে। দামী দেখে একটা ফোন কিনতে ইচ্ছে
করে, বাটন সেট ধরিয়ে দেয়। সারাক্ষণ
পড়াশোনা আর পড়াশোনা। স্কুলে নিয়ে যায়,
আবার নিয়েও আসে। স্কুলের বাহিরে দাঁড়িয়ে
কত রকমের খাবার খেতে ইচ্ছে করে, তাতেও
কত বাধা। যেখানে বলবে সেখানেই যেতে হবে।
যা বলবে তাই খেতে হবে। তারা আমাকে
একটুও বোঝে না, এমন মনে হয় না?

এতক্ষণ যা যা বললাম সবগুলোই তোমার সাথে
হয়েছে বা হবে। তাদের শক্র শক্র মনে হবে।
এবার তোমাকে বলি, তুমি তো বড় হচ্ছা।
এখন কিন্তু অনেক অনেক দায়িত্ব। প্রথম দায়িত্ব

কী জানো? বাবা-মায়ের সামনে নিজেকে বড় প্রমাণ করা। তুমি যে বড় সেটা কিভাবে প্রমাণ করবে? এই যে দেখো, তারা কত বাধা দেয়, তোমাদের স্বাধীনতা আটকে রাখে, কিন্তু কেন করে? তারা তো বাবা-মা, খুব ভয় পায়। এতদিন বুকের মাঝে যেই সন্তানকে আগলে রেখেছে, সেই সন্তানের বড় হওয়াকেও তারা ভয় পায়। এই বুঝি সন্তান তার সিগারেট ধরলো, এই বুঝি রেজাল্ট খারাপ করলো, এই বুঝি তার নাদান বাচ্চা ছেলেটা, অবুঝি মেয়েটা বিপদে পড়লো। একটু ভেবে দেখো, এই যে এত ভাবনা এগুলো কার জন্যে? তোমার জন্যে না?

তোমার সাথের অনেকেই হয়তো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়, তুমি যা যা পাচ্ছা না তারা সবই পাচ্ছে এবং করছে। এখন ভাবতে পারো, তাদের কেয়ার করে না? সব বাবা-মাই সন্তানকে খুব ভালোবাসে। একেকজনের কেয়ারিং একেকরকম। কদিন পর হয়ত দেখবে তাদের কেউ কেউ ভিন্নরকম হয়ে যাবে ঠিক এ কারণেই। আমি এখন শিখিয়ে দেব, কিশোর বয়সের তুমি বাবা-মাকে যেভাবে বুঝবে—১) মাঝে মাঝে মনে হবে তোমাকে তারা একটুও বোঝে না। তোমার কোনো কথাই শুনতে চায় না। হ্যাঁ, হতেই পারে এরকম। তোমাকে তারা না বুঝলেও তুমি তাদের বুঝবে। তোমার ওপর তাদের অনেক অধিকার, ভালোবাসার অধিকার।

এজন্যেই তারা তোমার কথা শুনতে চায় না। তারা ভাবেন তারাই ঠিক। তারা মাঝে মাঝে ভুলও হতে পারে, কিন্তু তোমার উচিত হবে বিষয়টা একটু বোঝা। তোমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেজে তারা তোমাকে আগলে রেখেছে, কঠিন এক সময়ের জন্যে প্রস্তুত করে দিচ্ছে। খুব কান্না আসবে, খুব অভিমান হবে। তারপরও নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখবে। চুপচাপ সব মেনে নিবে নিজের ভালোর জন্যেই।

২) কোনো বন্ধুর হাতে অনেক টাকা কিংবা দামী ফোন দেখলেও নিজেকে ছোট ছোট লাগতে পারে। তখন এটা একটু চিন্তা করো, এই যে তোমার হাতে টাকা দেওয়া হয়না কিংবা একটা বাটন ফোন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে এটাও তোমার দিয়েছিলাম না? সুইট সিক্রিটিন! সুইট জিনিসে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পিপড়ে ধরে যায়। তাকে খুব যত্নে রাখতে হয়। তোমার ব্যাপারটাও তেমনই। নিজেকে নিজেরই যত্নে রাখার কথা ছিল। তোমার অভিজ্ঞতা যে বড়ই কম। তাই বাবা-মায়ের অভিজ্ঞতার ওপর একটু বিশ্বাস রেখো, দেখবে আর ৪/৫ বছর পরই বুঝতে পারছো সবকিছু।

৩) এমনও হতে পারে, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিছুই ভালো লাগছে না। তখন তুমি তোমার

নিষ্পাপ হাত দুটো তুলে আঞ্চাহকে বলবে, ‘একটু দামী রত্ন। দামী রত্নগুলোকে আগলে রাখতে হয় বাতাস দাও হে রব! বুক ভরে শ্বাস নিতে চাই।’ না? তোমাদেরকেও তেমনি বাবা-মায়েরা খুব

৪) কোনো কিছুর দরকার হলে তাদের কাছে
সুন্দর করে বলবে। কী লাগবে এবং কেন
লাগবে তা যদি সুন্দর করে বলতে পারো দেখবে
ঠিকই পেয়ে যাচ্ছে।

৫) জানো ভাইয়া, এই সময়টায় সবকিছুকে খুব
রঙিন মনে হবে। মানুষের মনোযোগ পেতে
হচ্ছে করবে। এগুলো আমরা যারা বড় তাদেরও
কিন্তু হয়েছিল। তোমার অবুঝ সিদ্ধান্ত সবকিছু
তচ্ছন্দ করে দিতে পারে। তাই নিজেকে খুব
সামলে রাখবে। মনে রেখ, তুমি খুব দামী। খুব

করে আগলে রাখেন, যেন ভবিষ্যতে নিজেদের
আগলে রাখা শিখে যাও। চারিদিকে কত মানুষ
দেখ, কত সুন্দর সব জিনিস দেখ না? খুব
বিপদে পড়লে পাশে পাবে এই দু'জন
মানুষকেই। এক হাত ধরবে তোমার বাবা,
আরেক হাত তোমার মা। নিজেদের যত্ন করে
তৈরি করে ফেলো। আর মাত্র ৪/৫ বছর পরেই
যখন বাস্তবতায় নামবে, তখন যেন তুমি জিততে
পারো।

Send your writings: editor.sholo@gmail.com

[Click here for details](#)



আমরা পাঁদে উত্তরসূরী

- আফজাল আলফাজ



খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়ানাহ আনহ

নাম - আবু সুলাইমান খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা আল-মাখজুমি

জন্ম - ৫৯২, মক্কা, আরব উপদ্বীপ

উপাধি - সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারী)

প্রাথমিক জীবনঃ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রাঃ) আনুমানিক ৫৯২ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা ছিলেন কুরাইশ বংশের বানু মাখযুম গোত্রের শেখ। ওয়ালিদকে মক্কায় আল-ওয়াহিদ অর্থাৎ 'একক' বলে ডাকা হতো। খালিদের (রাঃ) মা লুবাবা আস-সুগরা বিনতু আল-হারিস ছিলেন মায়মুনা বিনতু আল-হারিসের (রাঃ) চাচাত বোন।

জন্মের পর কুরাইশদের ঐতিহ্য অনুযায়ী খালিদকে (রাঃ) মরত্ভূমির বেদুইনদের কাছে পাঠানো হয়। এখানে মরত্ভূমির শুষ্ক, বিশুদ্ধ আলো-বাতাসে পালক মায়ের কাছে তিনি লালিতপালিত হয়েছেন। পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে তিনি মক্কায় নিজের বাবা-মায়ের

কাছে ফিরে আসেন। বাল্যকালে তিনি গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর জীবন রক্ষা পেলেও তার মুখে বসন্তের চিহ্ন রয়ে গিয়েছিল। এসময় কুরাইশের শাখা বনু হাশিম, বনু আবদুদ-দার ও বনু মাখযুম ছিল মক্কার নেতৃত্বস্থানীয় গোত্র। বনু মাখযুম যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য দায়িত্ব বহন করত। তারা আরবের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীদের অন্যতম ছিল। খালিদ (রাঃ) অশ্বারোহণ, বর্ণ নিক্ষেপ, তীরধনুক ব্যবহার, তরবারী চালনা শিক্ষা করেছেন। বর্ণ তাঁর পছন্দের অস্ত্র ছিল বলা হয়। তরুণ বয়সে তিনি যোদ্ধা ও কুস্তিগীর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে খালিদ (রাঃ) ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা উমারের (রাঃ) মামাতো ভাই।

ইসলাম গ্রহণঃ ৬২৮ সালে হুদাইবিয়ার
সন্ধির ফলে মুসলিম ও মক্কার
কুরাইশদের মধ্যে দশ বছরের সন্ধি হয়।
এসময় খালিদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের
সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার বাল্যবন্ধু ইকরিমা
ইবনু আবু জাহলের সাথে এই বিষয়ে
আলাপ করেন। ইকরিমা খালিদের (রাঃ)
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। উক্ত
সিদ্ধান্তের ফলে খালিদ (রাঃ) আবু
সুফিয়ানের রোষের মুখে পড়েন। কিন্তু
ইকরিমা তাকে নিরস্ত করেছিলেন।
ইকরিমা আবু সুফিয়ানকে ভূমকি দেন যে,
তার ক্ষেত্রে কারণে ইকরিমা নিজেও
ইসলাম গ্রহণের দিকে ধাবিত হতে
পারেন এবং খালিদ (রাঃ) তাঁর নিজ
ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতা রাখে।
৬২৯ সালের মে মাসে খালিদ (রাঃ)
মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে
আমর ইবনুল আসের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ
হয়। তিনিও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে
মদিনায় যাচ্ছিলেন। তাঁরা একত্রে মদিনায়
পৌঁছান এবং প্রিয় নবীজি (সাঃ) এর
কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাইফুল্লাহ উপাধি লাভঃ গাসানিদের
বিরুদ্ধে অভিযানে মুহাম্মাদ (সাঃ) যায়িদ
বিন হারিসাকে (রাঃ) সেনাপতি হিসেবে
নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে
জাফর ইবনু আবি তালিব (রাঃ) এবং
তাঁরও মৃত্যু হলে আবদুল্লাহ ইবনু
রাওয়াহা (রাঃ) সেনাপতি হবেন এই
নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সবাই
শহীদ হলে নিজেদের মধ্য থেকে যে
কোনো একজনকে সেনাপতি নির্বাচন

করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যুদ্ধে যায়িদ
(রাঃ), জাফর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ (রাঃ)
তিনজনই শহীদ হন। এরপর খালিদকে
(রাঃ) সেনাপতি নির্বাচন করা হয়। এসময়
তার অধীনে মাত্র ৩,০০০ সৈনিক ছিল।
অন্যদিকে শত্রুপক্ষে ছিল ২,০০,০০০
সৈনিক। এই কঠিন পরিস্থিতিতে খালিদ
(রাঃ) মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ
করেন। কৌশল প্রয়োগ করে তিনি ভয়াবহ
হত্যাযজ্ঞের পরিস্থিতি থেকে যুদ্ধের মোড়
ঘূরিয়ে দেন। রাতের বেলা খালিদ (রাঃ)
সৈনিকদের কিছু দলকে মূল বাহিনীর পেছনে
পাঠিয়ে দেন। পরের দিন যুদ্ধ শুরু হওয়ার
পূর্বে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে একের পর
এক মুসলিমদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য
তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়। এর ফলে
শত্রুদের মনে বাড়তি সৈনিক আসছে এমন
ধারণা তৈরি হয় এবং মনোবল হ্রাস পায়।
সেদিন খালিদ (রাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান
সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হন। রাতের বেলা
সৈনিকরা প্রত্যাবর্তন করে। বাইজেন্টাইনরা
একে ফাঁদ ভেবে আর সামনে অগ্রসর হয়নি।
এই যুদ্ধে খালিদের (রাঃ) নয়টি তরবারী
ভেঙে গিয়েছিল। এই যুদ্ধের কারণে রাসূল
(সাঃ) তাঁকে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারী
উপাধিতে ভূষিত করেন।

পরবর্তী সামরিক অভিযানঃ হুদাইবিয়ার সন্ধি
বাতিল হওয়ার পর ৬৩০ সালে মুসলিমরা
মক্কা বিজয়ের জন্য অগ্রসর হন। এই
অভিযানে খালিদ (রাঃ) মুসলিম বাহিনীর
চারটি ভাগের একটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

এই চারটি বাহিনী চারটি ভিন্ন পথ
দিয়ে মক্ষ প্রবেশ করে। সেই বছরে
তিনি হৃনাইনের যুদ্ধ ও তাইফ
অবরোধে অংশ নেন। তাবুক অভিযানে
তিনি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর অধীনে
অংশ নিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে
দাওমাতুল জান্দালে প্রেরণ করা হয়।
সেখানে তিনি দাওমাতুল জান্দালের
যুদ্ধে লড়াই করেন এবং সেখানকার
আরব শাসককে বন্দী করেন। ৬৩১
সালে তিনি বিদায় হজ্জে অংশ
নিয়েছেন।

সেনাপতি হিসেবে সামরিক অভিযানঃ
৬৩০ সালের জানুয়ারিতে (শাবান ৮
হিজরি) খালিদকে (রা:) দেবী উয্যার
মৃত্তি ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করা
হয়। তিনি এই দায়িত্ব সম্পন্ন করেন।
বনু জাজিমা গোত্রকে ইসলামের
দাওয়াত দেওয়ার জন্য খালিদকে (রা:)
প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা “আমরা
সাবিয়ান হয়ে গিয়েছি” বলে ঘোষণা
করে। এরপর খালিদ (রা:) তাদেরকে
বন্দী করেন এবং কয়েকজনকে হত্যা
করেন। এরপর আবদুর রহমান ইবনু
আউফ তাঁকে বিরত করেন। দাওমাতুল
জান্দালের দুর্গে অবস্থানরত খ্রিস্টান
শাসক উকাইদিরকে আক্রমণের জন্য
খালিদকে (রা:) অভিযানে পাঠানো
হয়। ৬৩১ সালের মার্চে (জিলক্বদ, ৯ম
হিজরি) এই অভিযান সংঘটিত হয়।
এই অভিযানে খালিদ, উকাইদিরকে
বন্দী করেন।

পরে রাসূলুল্লাহ (সা:) তাকে মুক্তি দেন।
মুক্তিপণ হিসেবে উকাইদিরকে ২০০০ উট,
৮০০ ভেড়া, ৪০০ বর্ম ও ৪০০ বর্শা প্রদান
করতে হয়েছিল। এছাড়াও জিজিয়া প্রদানের
শর্ত আরোপ করা হয়। ৬৩১ সালের এপ্রিলে
পৌত্রিক দেবতা ওয়াদের মৃত্তি ধ্বংস করার
জন্য খালিদকে (রা:) দাওমাতুল জান্দালের
দ্বিতীয় অভিযানে প্রেরণ করা হয়। খালিদ
(রা:) মৃত্তি ধ্বংস করেন।

আবু বকরের (রা:) যুগেঃ রাসূলুল্লাহ (সা:)
এর ওফাতের পর অনেক আরব গোত্র
ইসলাম ত্যাগ করে এবং বিদ্রোহ ঘোষণা
করে। খলিফা আবু বকর (রা:) এসকল
ইসলামত্যাগী ও বিদ্রোহীদের দমনের জন্য
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। খালিদ (রা:)
এসময় আবু বকরের (রা:) উপদেষ্টা ছিলেন।
রিদার যুদ্ধের কৌশলগত পরিকল্পনা
প্রণয়নকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।
মুসলিম সেনাবাহিনীর শক্তিশালী অংশের
নেতৃত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। তাঁকে মধ্য আরবে
অভিযানে পাঠানো হয়েছিল। এটি ছিল
কৌশলগত দিক থেকে সবচেয়ে স্পর্শকাতর
অঞ্চল এবং শক্তিশালী বিদ্রোহীরা এখানে
অবস্থান করছিল। এই অঞ্চল মদিনার কাছে
ছিল তাই শহরের জন্যও ভূমকি বিবেচিত
হয়েছিল। খালিদ (রা:) প্রথমে তায়ি ও
জালিদার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

সাহাবি ও তায়ি গোত্রের একজন প্রধান আদি ইবনু হাতিম এখানে মধ্যস্থতা করেন। ফলে এই গোত্র খিলাফতের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। ৬৩২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে খালিদ (রাঃ) বুজাখার যুদ্ধে তুলাইহাকে পরাজিত করেন। তুলাইহা নিজেকে নবী দাবি করেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। গামরার যুদ্ধে তার অনুসারীরা পরাজিত হওয়ার পর তুলাইহার শক্তি খর্ব হয়। এরপর খালিদ (রাঃ) নাকরার দিকে অগ্রসর হন এবং নাকরার যুদ্ধে বনু সালিম গোত্রকে পরাজিত করেন। ৬৩২ সালের অক্টোবরে জাফরের যুদ্ধে গোত্রীয় নেতৃত্বে সালমার পরাজয়ের পর এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে আসে। মদিনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সুরক্ষিত হওয়ার পর খালিদ (রাঃ) নাজদের দিকে অগ্রসর হন। এখানে বানু তামিম গোত্রের শক্তি ঘাঁটি ছিল। এই গোত্র খিলাফতের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। অনেক গোত্র খালিদের (রাঃ) মুখোমুখি হতে এবং খিলাফতের কর্তৃত্ব সহজে মেনে নেয়নি। কিন্তু বনু ইয়ারবু গোত্র ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়। গোত্রের শেখ মালিক ইবনু নুয়াইরা খালিদের (রাঃ) বাহিনীর সাথে সরাসরি সংঘর্ষে ঘাননি। তিনি নিজ অনুসারীদের বিভিন্ন দলে ভাগ হওয়ার নির্দেশ দেন এবং নিজ পরিবারসহ মরুভূমির দিকে চলে যান। তিনি কর সংগ্রহ করে মদিনায় প্রেরণ করেন। তবে মালিককে বিদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং স্বঘোষিত নবী সাজাহর মিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। মালিককে তার গোত্রের সদস্যদের সাথে গ্রেপ্তার করা হয়।

খালিদ (রাঃ) তাকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মালিক এসময় “আপনার নেতা এটা বলেছেন, আপনার নেতা সেটা বলেছেন” এভাবে উত্তর দেন। নেতা দ্বারা আবু বকরকে (রাঃ) বুকানো হয়েছিল। উত্তরের ধরণ শুনে খালিদ (রাঃ) তাকে ইসলামত্যাগী ঘোষণা করে তার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন।

সাহাবী আবু কাতাদা আনসারী (রাঃ) মদিনা থেকেই খালিদের (রাঃ) সঙ্গী ছিলেন। মালিকের মৃত্যুদণ্ডের সংবাদে তিনি ব্যথিত হন এবং মদিনায় গিয়ে আবু বকরের (রাঃ) কাছে অভিযোগ করে বলেন যে, একজন মুসলিমের হত্যাকারীর অধীনে তিনি কাজ করবেন না। মালিকের মৃত্যু এবং খালিদ (রাঃ) কর্তৃক মালিকের স্ত্রী লায়লাকে গ্রহণের ফলে বিতর্ক তৈরি হয়। আবু বকর (রাঃ) ঘটনা ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য খালিদকে মদিনায় তলব করেন। খালিদ (রাঃ) মালিককে ইসলামত্যাগী ঘোষণা করলেও উমার (রাঃ) তাতে সন্তুষ্ট হননি। খালিদ (রাঃ) এরপর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ও স্বঘোষিত নবী মুসাইলামাকে উৎখাত করেন। ৬৩২ সালের ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ইয়ামামার যুদ্ধে খালিদ (রাঃ) মুসাইলামার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। মুসাইলামা যুদ্ধে নিহত হন।

পারস্য সাম্রাজ্যে অভিযানঃ বিদ্রোহ
দমনের পর সমগ্র আরব উপনিষদ
খিলাফতের অধীনে ঐক্যবন্ধ হয়। এরপর
আবু বকর (রাঃ) খিলাফতের সীমানা
বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেন।

খালিদকে (রাঃ) ১৮,০০০ সৈনিকসহ
পারস্য সাম্রাজ্যে প্রেরণ করা হয়। তাঁকে
পারস্য সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সম্পদশালী
অঞ্চল তথা নিম্ন মেসোপটেমিয়ার
ইউফ্রেটিস অঞ্চল (বর্তমান ইরাক)
জয়ের জন্য পাঠানো হয়। খালিদ (রাঃ)
তার বাহিনী নিয়ে নিম্ন মেসোপটেমিয়া
প্রবেশ করেন। যুদ্ধে অবর্তীর্ণ হওয়ার
পূর্বে খালিদ (রাঃ) প্রতিপক্ষকে
আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি
লেখেন—

‘ইসলামে প্রবেশ করো এবং নিরাপদ থাকো।
অথবা জিয়িয়া দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হও,
গোমরা ও গোমাদের জনগণ আমাদের নিরাপত্তা
লাভ করবে। অন্যথা ফলাফল নিয়ে গোমরা
নিজেদেরকেই দায়ী করবে, গোমরা জীবনকে
যেভাবে আকাঙ্ক্ষা করো আমি ঘৃণ্যকে যেভাবে
আকাঙ্ক্ষা করিব।’

— খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ

ধারাবাহিক চারটি যুদ্ধে খালিদ (রাঃ)
দ্রুত বিজয় অর্জন করেন। এগুলো হলো
শেকলের যুদ্ধ (এপ্রিল ৬৩৩), নদীর যুদ্ধ
(তৃতীয় সপ্তাহ, এপ্রিল ৬৩৩), ওয়ালাজার
যুদ্ধ (মে ৬৩৩) এবং উলাইসের যুদ্ধ
(মধ্য মে ৬৩৩)।

৬৩৩ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে নিম্ন
মেসোপটেমিয়ার আঞ্চলিক রাজধানী
আল-হিরার পতন ঘটে। অধিবাসীরা
জিয়িয়া প্রদান করতে রাজি হয় এবং
মুসলিমদের সহায়তা দিতে সম্মত হয়।
৬৩৩ সালের জুনে খালিদ (রাঃ) আনবার
অবরোধ করেন। ৬৩৩ সালে আনবারের
যুদ্ধের পর শহর আত্মসমর্পণ করে।
খালিদ (রাঃ) এরপর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর
হন এবং জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে
আইনুল তামির জয় করেন। এসময়
নাগাদ প্রায় সমগ্র নিম্ন মেসোপটেমিয়া
(উত্তরাঞ্চলীয় ইউফ্রেটিস অঞ্চল) খালিদের
(রাঃ) নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইতোমধ্যে খালিদ
(রাঃ) উত্তর আরবের দাওমাতুল জান্দালে
সহায়তার জন্য বার্তা পান। এখানে
আরেক মুসলিম সেনাপতি আয়াজ বিন
গানাম (রাঃ) প্রতিপক্ষ কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে
পড়েছিলেন। ৬৩৩ সালের আগস্টে
খালিদ (রাঃ) দাওমাতুল জান্দালে পৌঁছান
এবং দাওমাতুল জান্দালের যুদ্ধে
প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন। শহরের
দুর্গও অধিকার করা হয়। আরব থেকে
ফেরার পর খালিদ (রাঃ) পারস্যের
সেনাবাহিনী ও তাদের মিত্র আরব
শ্রিষ্ঠিনদের সেনা সমাবেশের খবর পান।
এসব বাহিনী ইউফ্রেটিস অঞ্চলের চারটি
ভিন্ন ক্যাম্পে ঘাঁটি করেছিল। এগুলো হল
হানাফিজ, জুমাইল, সানিই এবং
মুজাইয়া। শেষোক্তি সর্ববৃহৎ ছিল।
খালিদ (রাঃ) তাদের সম্মিলিত বাহিনীর
সাথে লড়াই না করে তিনিদিক থেকে
পৃথক

রাত্রিকালীন আক্রমণের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করেন এবং রাতের বেলা সমন্বিত আক্রমণ চালানো হয়। এর মাধ্যমে ৬৩৩ সালের নভেম্বরে মুজাইয়ার যুদ্ধ, এরপর সানিইর যুদ্ধ এবং জুমাইলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুসলিমদের এসকল বিজয়ের ফলে নিম্ন মেসোপটেমিয়া জয়ের জন্য পার্সিয়ানদের প্রচেষ্টা হ্রাস পায় এবং পার্সিয়ান রাজধানী তিসফুন অরক্ষিত হয়ে পড়ে। রাজধানীর উপর হামলা চালানোর পূর্বে খালিদ (রাঃ) দক্ষিণ ও পশ্চিমের সকল পার্সিয়ান শক্তিকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর সীমান্ত শহর ফিরাজের দিকে অগ্রসর হন সাসানীয়, বাইজেন্টাইন ও খ্রিস্টান আরবদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। ৬৩৩ সালের ডিসেম্বরে সংঘটিত ফিরাজের যুদ্ধে শহরের দুর্গ অধিকার করা হয়। তার নিম্ন মেসোপটেমিয়া জয়ের অভিযানে এটা ছিল শেষ যুদ্ধ। এরপর কাদিসিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তিনি আবু বকরের (রাঃ) নির্দেশ সংবলিত চিঠি পান। চিঠিতে তাকে সিরিয়ায় গিয়ে মুসলিমদের কমান্ড গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। ইরাকে অবস্থানকালীন সময়ে খালিদ (রাঃ) বিজিত অঞ্চলের সামরিক গভর্নর হিসেবেও দায়িত্বপালন করেছেন।

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য অভিযানঃ
সাসানীয়দের বিরুদ্ধে সফল অভিযানের পর খলিফা আবু বকর (রাঃ) খালিদকে (রাঃ) রোমান সিরিয়ায় প্রেরণ করেন।

চারটি সেনাদলের মাধ্যমে অভিযান চালানো হয়। এদের পৃথক লক্ষ্যবস্তু ছিল। বাইজেন্টাইনরা বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে তাদের ইউনিটগুলি আজনাদয়ানে একত্রিত করে। এই পদক্ষেপের ফলে মুসলিম সেনারা সীমান্ত অঞ্চলে আটকা পড়ে এবং তাদের পেছনে এই বৃহৎ বাহিনী গ্রহণ করায় মুসলিম বাহিনীর পক্ষে মধ্য বা উত্তর সিরিয়ায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। বাইজেন্টাইনদের তুলনায় মুসলিমদের সেনা সংখ্যা অপ্রতুল ছিল। সিরিয়ান রণাঙ্গনের মুসলিম প্রধান সেনাপতি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) খলিফা আবু বকরের (রাঃ) কাছে সহায়তা চেয়ে বার্তা পাঠান। এরপর আবু বকর খালিদের (রাঃ) নেতৃত্বে অতিরিক্ত সৈনিক প্রেরণ করেন।

ইরাক থেকে সিরিয়া যাওয়ার দুইটি পথ ছিল। একটি দাওমাতুল জান্দালের মধ্য দিয়ে এবং অন্যটি মেসোপটেমিয়া হয়ে আর-রাকার মধ্য দিয়ে। দাওমাতুল জান্দালের পথ দীর্ঘ ছিল এবং এই পথে কয়েক সপ্তাহ লেগে যেত। সিরিয়ায় মুসলিমদের তৎক্ষণিক সহায়তা প্রয়োজন ছিল বিধায় খালিদ (রাঃ) এই পথ পরিহার করেন। উত্তর সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় রোমান ঘাঁটির কারণে তিনি মেসোপটেমিয়ার পথও এড়িয়ে যান। এসবের পরিবর্তে সিরিয়ান মরুভূমির মধ্য দিয়ে একটি অপ্রচলিত পথকে বেছে নেন।

তিনি মরুভূমির মধ্য দিয়ে নিজ বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যান। দীর্ঘ বিরতি দিয়ে সেনাবাহিনীর উটগুলিকে পানি পান করতে দেয়া হয় যাতে উট একবারে বেশি পান করে। উটের পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকায় প্রয়োজনের মুহূর্তে উট জবাই করে পানি সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। এই ব্যবস্থা কার্যকর প্রমাণিত হয়। ৬৩৪ সালের জুন মাসে খালিদ (রাঃ) সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। শীঘ্রই তিনি সীমান্তের সাওয়া, আরাক, পালমিরা, সুখনা, কারিয়াতাইন ও হাওয়ারিনের দুর্গ দখল করে নেন। শেষের দুইটি দুর্গ কারতিনের যুদ্ধ ও হাওয়ারিনের যুদ্ধের পর অধিকৃত হয়। এসকল দুর্গের নিয়ন্ত্রণ লাভের পর খালিদের (রাঃ) বাহিনী সিরিয়া-আরব সীমান্তের বুসরা শহরের দিকে অগ্রসর হন। এই শহর ছিল বাইজেন্টাইনদের মিত্র গাসানি আরব স্থিত রাজ্যের রাজধানী। উকাব গিরিপথ অতিক্রমের মাধ্যমে তিনি দামেক এড়িয়ে যান। মারাজ-আল-রাহাতে খালিদ (রাঃ) গাসানি বাহিনীকে পরাজিত করেন।

খালিদের (রাঃ) আসার খবর পেয়ে আবু উবাইদা (রাঃ) চারটি সেনাদলের কমান্ডারদের অন্যতম শুরাহবিল ইবনু হাসানাকে বুসরা আক্রমণের নির্দেশ দেন। শুরাহবিল তার ৪,০০০ সৈনিক নিয়ে বুসরা অবরোধ করেন। বাইজেন্টাইনদের সেনাসংখ্যা শুরাহবিলের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তারা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে প্রায় প্রদুষ্ট করে ফেলেছিল।

এসময় খালিদের (রাঃ) অশ্বারোহীরা উপস্থিত হয় এবং বাইজেন্টাইনদের উপর আক্রমণ করে। বাইজেন্টাইনরা নগর দুর্গে আশ্রয় নেয়। আবু উবাইদাহ (রাঃ) বুসরায় এসে খালিদের (রাঃ) সাথে যোগ দেন এবং খলিফার নির্দেশ মোতাবেক খালিদ (রাঃ) সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তৃত গ্রহণ করেন। ৬৩৪ সালের জুলাই মাসের মধ্যভাগে বুসরার দুর্গ আত্মসমর্পণ করে। বুসরা অধিকার করার পর খালিদ (রাঃ) সকল মুসলিম সেনাদলকে আজনাদায়নে তার সাথে যোগ দিতে বলেন। ৩০ জুলাই এখানে সংঘটিত আজনাদায়নের যুদ্ধে বাইজেন্টাইনরা পরাজিত হয়। আধুনিক ইতিহাসবিদদের এই যুদ্ধে জয়ের ফলে সিরিয়া অনেকটাই মুসলিমদের হাতে এসে পড়ে। খালিদ (রাঃ) বাইজেন্টাইনদের শক্ত ঘাঁটি দামেক দখলের সিদ্ধান্ত নেন। এখানে বাইজেন্টাইন সন্তাট হিরাক্লিয়াসের জামাতা থমাস শহরের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। খালিদের (রাঃ) অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে তিনি শহরের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। এসময় হিরাক্লিয়াস এমেসায় ছিলেন। থমাস তার কাছে অতিরিক্ত সৈনিক চেয়ে চিঠি পাঠান। এছাড়াও খালিদের (রাঃ) অগ্রযাত্রার গতি হ্রাস এবং আসন্ন অবরোধের প্রস্তুতির জন্য থমাস নিজ বাহিনীকে প্রেরণ করেছিলেন।

তার দুইটি সেনাদলের প্রথমটি আগস্টের মধ্যভাগে ইয়াকুসায় এবং দ্বিতীয়টি ১৯ আগস্ট মারাজ আস-সাফফারে ধ্বংস হয়। ইতোমধ্যে হিরাক্লিয়াসের কয়েকটি সেনাদলের পূর্বে প্রেরিত সহায়তা এসে পৌছায়। দামেস্ককে বাকি অঞ্চল থেকে বিছিন্ন করার জন্য খালিদ (রাঃ) দক্ষিণে ফিলিস্তিনের রুটে, উত্তরে দামেস্ক-এমেসা রুটে এবং দামেস্কের দিকের রুটসমূহে কিছু সেনাদল প্রেরণ করেন।

হিরাক্লিয়াসের প্রেরিত সেনাদলগুলিকে দামেস্ক থেকে ৩০ কিমি দূরে সানিতা-আল-উকাবের যুদ্ধে খালিদ (রাঃ) বিতাড়িত করেন। ৩০ দিন অবরোধের পর ৬৩৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর খালিদ (রাঃ) দামেস্ক জয় করেন। দামেস্কের পতনের খবর পেয়ে সন্ত্রাট হিরাক্লিয়াস এমেসা থেকে এন্টিওকের দিকে রওয়ানা হন। খালিদের (রাঃ) অশ্বারোহী বাহিনী অঙ্গাত এক পথের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে দামেস্ক থেকে ১৫০ কিমি উত্তরে এন্টিওকের দিকে রওয়ানা হওয়া দামেস্কের বাইজেন্টাইন গেরিসনের উপর আক্রমণ করে।

দামেস্ক অবরোধের সময় আবু বকর (রাঃ) ওফাত বরণ করেন। এরপর উমার (রাঃ) নতুন খলিফা হন। উমার (রাঃ) খালিদকে (রাঃ) পদচুত করে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে (রাঃ) সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার নিয়োগ দেন। অবরোধ

চলাকালীন সময়ে আবু উবাইদা (রাঃ) তার নিয়োগ ও খালিদের (রাঃ) পদচুতির চিঠি পেয়েছিলেন কিন্তু শহর জয় করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি খবর জানানো থেকে বিরত ছিলেন। খালিদ (রাঃ) অপরাজেয় হওয়ায় অনেক মুসলিম তাঁর কারণে যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হচ্ছে বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে।

এই ব্যাপারে উমার (রাঃ) বলেছিলেন-‘আমি খালিদ বিন ওয়ালিদকে (রাঃ) আমার ক্রোধ বা তার দায়িত্বহীনতার কারণে অব্যাহতি দিইনি। বরং আমি লোকেদের জানাতে চেয়েছিলাম যে, বিজয় আল্লাহর তরফ থেকে আসে।’

খালিদ (রাঃ) খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে নির্দেশ অনুযায়ী আবু উবাইদার (রাঃ) অধীনে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তিনি বলেছিলেন-‘যদি আবু বকর (রাঃ) ইন্তেকাল করেন আর উমার (রাঃ) খলিফা হন, তবে আমরা শুনব এবং মানব।’

আবু উবাইদার (রাঃ) নেতৃত্বে এরপর সিরিয়া অভিযান চলতে থাকে। আবু উবাইদা (রাঃ) খালিদের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি খালিদকে অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং নিজের সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন।

মধ্য লেভান্ট বিজয়ঃ আবু উবাইদা (রাঃ) প্রধান কমান্ডার নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি আবু-আল-কুদসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক মেলায় একটি ছোট সেনাদল পাঠান। বাইজেন্টাইন ও খ্রিস্টান আরব গেরিসন এই মেলা পাহারা দিচ্ছিল। গেরিসনের সৈনিকরা দ্রুত মুসলিমদের ঘিরে ফেলে। সেনাদলটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্বে আবু উবাইদা (রাঃ) গোয়েন্দা মারফত খবর পান এবং তাদের উদ্ধার করার জন্য খালিদ (রাঃ) কে প্রেরণ করেন। ৬৩৪ সালের ১৫ অক্টোবর সংঘটিত আবু-আল-কুদসের যুদ্ধে খালিদ (রাঃ) তাদের পরাজিত করেন। উক্ত মেলা থেকে প্রচুর সম্পদ অর্জিত হয় এবং অনেক রোমান বন্দী হয়।

মধ্য সিরিয়া অধিকারের মাধ্যমে মুসলিমরা বাইজেন্টাইনদের উপর প্রবল প্রভাব সৃষ্টি করে। উত্তর সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের মধ্যে যোগাযোগ এসময় বন্ধ হয়ে যায়। আবু উবাইদা (রাঃ) ফাহলের দিকে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন। এখানে একটি শক্তিশালী বাইজেন্টাইন গেরিসন ও আজনাদায়নের যুদ্ধে রক্ষা পাওয়ারা আশ্রয় নিয়েছিল। বাইজেন্টাইনরা এখান থেকে পূর্ব দিকে আক্রমণ করতে পারতো এবং এর ফলে আরব থেকে সহায়তা বন্ধ হয়ে যেত বলে এই অঞ্চল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এছাড়াও পেছনে বৃহৎ গেরিসন থাকায় ফিলিস্তিনে অভিযান চালানো সম্ভব ছিল না। মুসলিম বাহিনী ফাহলের দিকে যাত্রা করে। খালিদ (রাঃ) এই বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ৬৩৫ সালের ২৩ জানুয়ারি সংঘটিত ফাহলের যুদ্ধে বাইজেন্টাইন বাহিনী পরাজিত হয়।

এমেসার যুদ্ধ এবং দামেক্সের দ্বিতীয় যুদ্ধঃ ফাহলের বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আমর ইবনুল আস (রাঃ) ও শুরাহবিল ইবনু হাসানা (রাঃ) ফিলিস্তিন জয়ের জন্য দক্ষিণে এবং আবু উবাইদা (রাঃ) ও খালিদ (রাঃ) উত্তর সিরিয়া জয়ের জন্য উত্তরদিকে যাত্রা করেন। মুসলিমরা ফাহলে ব্যস্ত থাকাকালীন স্মার্ট হিরাক্লিয়াস সুযোগ লাভ করেন। দামেক্স পুনরাধিকারের জন্য তিনি দ্রুত সেনাপতি থিওডরের অধীনে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। হিরাক্লিয়াসের এই নতুন বাহিনী প্রেরণের পর মুসলিমরা ফাহল থেকে এমেসার দিকে যাত্রা করছিল। এমেসার দিকে অর্ধেক যাত্রা করার পর মুসলিম ও বাইজেন্টাইন বাহিনী মারাজ-আল-রোমে মুখোমুখি হয়। সেনাপতি থিওডর রাতের বেলা বাহিনীর অর্ধেককে দামেক্সের মুসলিম গেরিসনে অতর্কিত আক্রমণের জন্য পাঠান। খালিদের (রাঃ) গোয়েন্দারা তাকে এই খবর জানায়। আবু উবাইদার (রাঃ) অনুমতিক্রমে তিনি মোবাইল গার্ডদের নিয়ে দামেক্সের দিকে রওয়ানা হন। মারাজ-আল-রোমের যুদ্ধে আবু উবাইদা (রাঃ) রোমানদের সাথে লড়াই করার সময় খালিদ (রাঃ) দামেক্সের দিকে যাত্রা করেন এবং দামেক্সের দ্বিতীয় যুদ্ধে সেনাপতি থিওডরকে পরাজিত করেন।

একসপ্তাহ পর আবু উবাইদা (রাঃ) বালিক জয় করেন। এখানে জুপিটারের মন্দির অবস্থিত ছিল। এরপর তিনি খালিদকে (রাঃ) এমেসার দিকে পাঠান। এমেসা ও চেলসিসের তরফ থেকে এক বছরের শান্তির আবেদন করা হয়। আবু উবাইদা (রাঃ) এই আবেদন গ্রহণ করে অন্যান্য বিজিত অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করায় মনোযোগী হন। তিনি হামা, মারাত আন-নুমান জয় করেন। হিরাক্লিয়াসের নির্দেশনায় সম্পাদিত শান্তিচুক্তিগুলির কারণ ছিল যাতে উত্তর সিরিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাওয়া যায়। এন্টিওকে বাহিনী গঠন করার পর হিরাক্লিয়াস তাদেরকে উত্তর সিরিয়ার কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাঠান, বিশেষত চেলসিসের দুর্গে। শহরে বাইজেন্টাইন বাহিনীর আগমনের ফলে শান্তিচুক্তি লঙ্ঘিত হয়। এরপর আবু উবাইদা (রাঃ) ও খালিদ (রাঃ) এমেসার দিকে যাত্রা করেন। খালিদ (রাঃ) অগ্রবর্তী দলকে নিয়ে বাইজেন্টাইন বাহিনীকে পরাজিত করা হয়। মুসলিমরা এমেসা অবরোধ করে। দুই মাস অবরোধের পর ৬৩৬ সালের মার্চ এমেসা আগ্রসমর্পণ করে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধঃ এমেসা অধিকার করার পর মুসলিমরা উত্তর সিরিয়া অধিকারের জন্য যাত্রা করে। ইতোমধ্যে হিরাক্লিয়াস এন্টিওকে একটি বৃহদাকার সেনাদল গঠন করে। উত্তর সিরিয়ার রোমান বন্দীদের কাছ থেকে খালিদ (রাঃ) এই খবর পান। পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে হিরাক্লিয়াস মুসলিমদের বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিত লড়াইয়ে নামতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি মুসলিম সেনাদলগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করে ফেলে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করেন।

৬৩৬ সালের জুনে পুনরাধিকারের জন্য পাঁচটি বৃহদাকার সেনাদল বিভিন্ন দিক থেকে সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করা হয়, এর সংখ্যা ২,৪০,০০০। খালিদ (রাঃ) হিরাক্লিয়াসের পরিকল্পনা আন্দাজ করতে পারেন। যুদ্ধসভায় তিনি আবু উবাইদাকে (রাঃ) সব মুসলিম সেনাদল এক স্থানে জমায়েত করার প্রস্তাব দেন, যাতে বাইজেন্টাইনদের সাথে চূড়ান্তভাবে লড়াই করা সম্ভব হয়। খালিদের (রাঃ) পরামর্শক্রমে আবু উবাইদা (রাঃ) সিরিয়ার সকল মুসলিম সেনাদলকে বিজিত অঞ্চল ত্যাগ করে জাবিয়ায় একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। এর ফলে হিরাক্লিয়াসের পরিকল্পনা ভেঙ্গে যায়। তিনি মুসলিমদের সাথে খোলা ময়দানে যুদ্ধে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ এর ফলে মুসলিমদের হালকা অশ্বারোহী বাহিনী বাইজেন্টাইনদের ভারি এবং কম দ্রুততাসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনীর উপর আধিপত্য স্থাপন করার সম্ভাবনা ছিল। খালিদের (রাঃ) পরামর্শ অনুযায়ী আবু উবাইদা (রাঃ) মুসলিম বাহিনীকে জাবিয়া থেকে ইয়ারমুক নদীর সমতল ভূমিতে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। এই স্থানে পশ্চাদ্য ও পানির সরবরাহ ভালো ছিল এবং এখানে অশ্বারোহীদেরকে অধিক কার্যকারিতার সাথে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। যুদ্ধসভায় আবু উবাইদা (রাঃ) মুসলিম বাহিনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব খালিদের (রাঃ) হাতে তুলে দেন।

খালিদ (রাঃ) যুদ্ধের মাঠ পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন এবং বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করায় মূল পরিকল্পনাকারীর ভূমিকা রাখেন। ১৫ আগস্ট ইয়ারমুকের যুদ্ধ শুরু হয় এবং ছয়দিন ধরে চলে। যুদ্ধে বাইজেন্টাইন পক্ষ পরাজিত হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধ ইতিহাসের অন্যতম ফলাফল নির্ধারণকারী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত পরাজয়ের মাত্রার কারণে বাইজেন্টাইনদের বিপর্যয় সামলে উঠতে সময় লেগে যায়। তখন পর্যন্ত সিরিয়ায় সংঘটিত যুদ্ধসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই যুদ্ধে বিজয় ছিল মূলত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর কৌশলগত নৈপুণ্য। মারাজ-আল-দিবাজের যুদ্ধের পর স্বাট হিরাক্সিয়াস তার মেয়ের মৃত্যুর জন্য খালিদের কাছে একজন দৃত পাঠান। দৃত খালিদকে স্বাটের যে চীর্তি দেন তাতে নিম্নোক্ত কথা লেখা ছিল-

‘আপনি আমার সেনাবাহিনীকে কী করেছেন তা আমি জানতে পেরেছি। আপনি আমার জামাগাকে হত্যা এবং আমার মেয়েকে বন্দি করেছেন। আপনি বিজয়ী থয়েছেন এবং নিরাপদে যেতে পেরেছেন। এখন আমি আপনার কাছে আমার মেয়েকে চাইছি। আপনি মুক্তিপ্রের বিনিময়ে তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন অথবা উপর্যাহ হিসেবে আমাকে দিন, কারণ আপনার চরিত্রে সংশ্লান একটি শক্তিশালী উপাদান।’

খালিদ (রাঃ) দৃতকে বলেন-‘তাকে উপর্যাহ হিসেবে নিয়ে যান, কোনো মুক্তিপ্রে দিতে হবে না।’

জেরুজালেম জয়ঃ যুদ্ধে বাইজেন্টাইনরা পরাজিত ও বিস্ফিন্ত হওয়ার পর মুসলিমরা দ্রুত ইয়ারমুকের পূর্বে বিজিত এলাকা পুনরায় অধিকার করে নেয়। এরপর মুসলিমরা দক্ষিণ দিকে বাইজেন্টাইনদের শেষ শক্ত ঘাঁটি জেরুসালেমের দিকে অগ্রসর হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ নেয়া অনেক বাইজেন্টাইন সদস্য এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। জেরুজালেমের অবরোধ চার মাস স্থায়ী হয়। এরপর খলিফা উমারকে (রাঃ) আসতে হবে এই শর্তে জেরুসালেম সমর্পণ করে। জেরুজালেম সমর্পণের পর মুসলিম বাহিনীকে পুনরায় কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়।

ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ানের (রাঃ) সেনাদল দামেক্ষ আসে এবং বৈরুত অধিকার করে। আবু ইবনুল আস (রাঃ) ও শুরাহবিল ইবনু হাসানার (রাঃ) সেনাদল ফিলিস্তিনের বাকি অঞ্চল অধিকারের জন্য অগ্রসর হয়। আবু উবাইদা (রাঃ) ও খালিদের (রাঃ) ১৭ হজার সৈনিকের সেনাদল সমগ্র উত্তর সিরিয়া অধিকারের জন্য অগ্রসর হয়।

উত্তর সিরিয়া জয়ঃ এমেসা ইতোমধ্যে হস্তগত হয়েছিল। আবু উবাইদা (রাঃ) ও খালিদ (রাঃ) চেলসিসের দিকে যাত্রা করেন। কৌশলগত কারণে এটি বাইজেন্টাইনদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ছিল। এখান থেকে তারা আনাতোলিয়া, আর্মেনিয়া ও এন্টিওককে রক্ষা করতে সক্ষম ছিল। আবু উবাইদা (রাঃ)

খালিদকে (রাঃ) সম্পূর্ণ মোবাইল গার্ড বাহিনী প্রদান করে চেলসিসের দিকে প্রেরণ করেন। কমান্ডার মেনাসের অধীনে গ্রীক সৈনিকরা এটি প্রহরা দিচ্ছিল। বলা হয় যে, তিনি সম্ভাটের পর দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাইজেন্টাইনদের প্রথামাফিক কৌশল বাদ দিয়ে খালিদের (রাঃ) মুখোমুখি হওয়ার এবং মুসলিমদের মূল বাহিনী এসে পৌছার পূর্বে অগ্রবর্তী দলকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন। চেলসিস থেকে ৫ কিমি পূর্বে সংঘটিত হাজিরের যুদ্ধে রোমানরা পরাজিত হয়। এই বিজয়ের পর উমার (রাঃ) খালিদের (রাঃ) সামরিক কৃতিত্বের প্রশংসা করেছিলেন। উমর (রাঃ) নিম্নোক্ত কথা বলেছিলেন বলে জানা যায়-

‘খালিদ সত্ত্বিকার সেনাপতি, আল্লাহ আবু বকরের উপর রহম করুক। তিনি মানুষকে আমার চেয়েও উগ্রমুক্তিপে চিনতে পারতেন।’

আবু উবাইদা (রাঃ) শীঘ্রই চেলসিসে খালিদের (রাঃ) সাথে যোগ দেন। ৬৩৭ সালের জুন মাসে চেলসিস আত্মসমর্পণ করে। এই বিজয়ের ফলে চেলসিসের উত্তরের অঞ্চল মুসলিমদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। এরপর খালিদ (রাঃ) ও আবু উবাইদা (রাঃ) অক্ষোবরে আলেক্সো অধিকার করেন। এরপরের লক্ষ্যবস্তু ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এশীয় অঞ্চলের রাজধানী এন্টিওক। এন্টিওকের দিকে যাত্রা করার পূর্বে খালিদ (রাঃ) ও আবু উবাইদা (রাঃ) শহরটিকে আনাতোলিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেন।

এই উদ্দেশ্যে এন্টিওককে কৌশলগত প্রতিরক্ষা প্রদানকারী সকল দুর্গকে দখল করা হয়। এর মধ্যে এন্টিওকের উত্তরপূর্বের আজাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অরন্তেস নদীর নিকটে বাইজেন্টাইন বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ ‘লোহা সেতুর’ যুদ্ধ নামে পরিচিত। বাইজেন্টাইনরা পরাজিত হওয়ার পর এন্টিওকে আশ্রয় নিলে মুসলিমরা শহর অবরোধ করে। সম্ভাটের দিক থেকে সাহায্যের আশা ক্ষীণ হওয়ায় সকল বাইজেন্টাইন সৈনিককে নিরাপদে কনস্টান্টিনোপল যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে এই শর্তে ৬৩৭ সালের ৩০ মার্চ এন্টিওক আত্মসমর্পণ করে।

আবু উবাইদা (রাঃ) খালিদকে (রাঃ) উত্তর দিকে পাঠান এবং নিজে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে লাজকিয়া, জাবলা, তারতুস ও লেবানন পর্বতমালার বিপরীতের উপকূল জয় করে। খালিদ (রাঃ) উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে আনাতোলিয়ার কিজিল নদীর অববাহিকায় অভিযান চালান। মুসলিমদের আগমনের পূর্বে সম্ভাট হিরাক্লিয়াস এন্টিওক ত্যাগ করে এডেসা চলে গিয়েছিলেন। তিনি আল-জাজিরা ও আমেনিয়ায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে রাজধানী কনস্টান্টিনোপল রওয়ানা হন। এসময় তিনি অল্লের জন্য খালিদের (রাঃ) মুখোমুখি হওয়া থেকে বেঁচে

যান। খালিদ (রাঃ) এসময় মারাশ অধিকার করার পর দক্ষিণে মুনবিজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ইয়ারমুকে বাইজেন্টাইনদের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে সাম্রাজ্য দৃঢ়ভাবে মুসলিমদের করায়ত হয়। সামরিক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে হিরাক্লিয়াসের পক্ষে সিরিয়া ফিরে পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো সম্ভব ছিল না।

হিরাক্লিয়াস জাজিরার খ্রিষ্টান আরবদের নিকট সহায়তা চান। তারা একটি বৃহৎ সেনাদল গঠন করে এবং আবু উবাইদার (রাঃ) সদর দপ্তর এমেসার দিকে যাত্রা করে। আবু উবাইদা (রাঃ) সমগ্র উত্তর সিরিয়া থেকে তার সেনাদের এমেসায় ফিরিয়ে আনেন এবং খ্রিষ্টান আরবরা এমেসা অবরোধ করে। খালিদ (রাঃ) দুর্গের বাইরে উন্মুক্ত ময়দানে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আবু উবাইদা (রাঃ) এই বিষয়ে খলিফা উমারের (রাঃ) কাছে বার্তা পাঠান। খলিফা উমার (রাঃ) বিষয়টি দক্ষতার সাথে নিষ্পত্তি করেন। তিনি তিনটি ভিন্ন দিক থেকে ইরাকের মুসলিম বাহিনীকে প্রতিপক্ষ খ্রিষ্টান আরবদের আবাসভূমি জাজিরা আক্রমণের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি কা'কা ইবনু আমরের (রাঃ) নেতৃত্বে ইরাক থেকে আরেকটি সেনাদল এমেসায় পাঠানো হয়। কা'কা ইবনু আমর (রাঃ) ইতিপূর্বে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং কাদিসিয়ার যুদ্ধের জন্য তাকে ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। উমার (রাঃ) ব্যক্তিগতভাবে এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনা থেকে অগ্রসর হন। এসকল পদক্ষেপের ফলে খ্রিষ্টান আরবরা অবরোধ তুলে নেয়। এ পর্যায়ে

খালিদ (রাঃ) তাঁর মোবাইল গার্ডদের নিয়ে এমেসা থেকে বেরিয়ে এসে তাদের উপর আক্রমণ চালান। সিরিয়া ফিরে পাওয়ার জন্য এটি ছিল হিরাক্লিয়াসের সর্বশেষ প্রচেষ্টা।

আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়া অভিযানঃ এই যুদ্ধের পর উমর (রাঃ) জাজিরা জয়ের নির্দেশ দেন। ৬৩৮ সালের গ্রীষ্মের শেষানাগাদ এই অভিযান সম্পন্ন হয়। জাজিরা জয়ের পর খালিদ (রাঃ) ও জাজিরা বিজেতা আয়ায বিন গানিম (রাঃ) উভয়কে আবু উবাইদা (রাঃ) জাজিরার উত্তরের বাইজেন্টাইন অঞ্চল আক্রমণের নির্দেশ দেন। তারা অগ্রসর হয়ে এডেসা, দিয়ারবাকির, মালাতিয়া জয় করেন এবং আরারাত অঞ্চল পর্যন্ত বাইজেন্টাইন আর্মেনিয়া আক্রমণ চালান। এছাড়াও তাঁরা মধ্য আনাতোলিয়ায় আক্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়। হিরাক্লিয়াস ইতোমধ্যে মুসলিম নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল এবং আনাতোলিয়ার মূল ভূখণ্ডের মধ্যে ‘নো ম্যানস ল্যান্ড’ প্রতিষ্ঠার জন্য এন্টিওক ও তারতুসের মধ্যবর্তী দুর্গগুলি পরিত্যাগ করেছিলেন। উমার (রাঃ) এরপর মুসলিমদেরকে আনাতোলিয়ায় বেশি অগ্রসর হতে দেননি। এর পরিবর্তে তিনি আবু উবাইদাকে (রাঃ) বিজিত অঞ্চলে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। আনাতোলিয়া ও আর্মেনিয়া অভিযান ছিল খালিদের (রাঃ) সামরিক জীবনের সমাপ্তি।

সেনাবাহিনী থেকে পদচুতিঃঃ খালিদ (রাঃ) এসময় তার কর্মজীবনের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছান। তিনি খ্যাত হয়ে উঠেন এবং মুসলিমদের কাছে তিনি জাতীয় বীর গণ্য হতেন। জনসাধারণ তাকে ‘সাইফুল্লাহ’ (আল্লাহর তরবারী) বলে ডাকত। খালিদ (রাঃ) মারাশ অধিকার করার কিছুকাল পর জানতে পারেন যে, খ্যাতনামা কবি আশ'আস খালিদের (রাঃ) প্রশংসা করে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। খালিদ (রাঃ) তাকে ১০,০০০ দিরহাম উপহার হিসেবে দেন।

উমার (রাঃ) এই ঘটনাকে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হিসেবে বিবেচনা করেন। উমার (রাঃ) আবু উবাইদাকে (রাঃ) চিঠি লিখে খালিদের (রাঃ) অর্থের উৎস বের করার নির্দেশ দেন। বলা হয়েছিল যে, যদি খালিদ (রাঃ) রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দেন তবে তা ক্ষমতার অপব্যবহার। আর যদি তিনি নিজের অর্থ প্রদান করেন তবে তা অপচয়। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হবেন। আবু উবাইদাকে (রাঃ) এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। আবু উবাইদা (রাঃ) খালিদের (রাঃ) গুণগ্রাহী ছিলেন এবং ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন। ফলে এই দায়িত্ব পালন তাঁর জন্য কঠিন ছিল। এর পরিবর্তে তিনি বিলাল ইবনু রাবাহকে (রাঃ) কে দায়িত্ব দেন এবং খালিদকে (রাঃ) চেলসিস থেকে এমেসায় তলব করেন। খালিদ (রাঃ) বলেন, তিনি নিজের অর্থ থেকে এই উপহার দিয়েছেন। তিনি আবু উবাইদার (রাঃ) কাছে উপস্থিত হলে আবু উবাইদা (রাঃ) তাঁকে জানান যে, উমারের (রাঃ) নির্দেশে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

এর মাধ্যমে খালিদের (রাঃ) সামরিক জীবনের ইতি ঘটে।

ওফাতঃ উমার (রাঃ) এর প্রতি খালিদ (রাঃ) খারাপ মনোভাব পোষণ করতেন না। খালিদ (রাঃ) বলেন—
‘উমার (রাঃ) যখন আমাকে পদচুত করেন, আমি মর্মাহত হই। কিন্তু আমি এখন বুঝতে পারছি, উমার (রাঃ) যা করেছেন সঠিক করেছেন। কারণ উমার (রাঃ) শুধুমাত্র মুমিনদের কল্যাণ চায়েছেন। এবং উমারের (রাঃ) জন্য আমার মনে কোনরকম কালিঙ্গ নেই।’

মৃত্যুর আগে খালিদ (রাঃ) তার সম্পদ উমারের (রাঃ) হাতে অর্পণ করে যান এবং উমারকে (রাঃ) ‘নিজ অসিয়তের বাস্তবায়নকারী’ মনোনীত করেছিলেন। পদচুতির চার বছর পর ৬৪২ সালে খালিদ (রাঃ) ইতেকাল করেন। তাঁকে এমেসায় দাফন করা হয়। সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর থেকে তিনি সেখানে বসবাস করেছিলেন।

খালিদের (রাঃ) কবরফলকে তার নেতৃত্বাধীনে বিজিত হওয়া ৫০টি যুদ্ধের নাম (ছোট যুদ্ধ ব্যতীত) উৎকীর্ণ রয়েছে। তিনি যুদ্ধে শহীদ হতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাই বাড়িতে মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিমর্শ হয়ে যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আফসোসের সুরে বলেন—

‘আমি শাহাদাতের ইচ্ছা নিয়ে এত বেশি যুদ্ধে লড়াই করেছি যে, আমার শরীরের কোনো অংশ ক্ষণচিহ্নবিহীন নেই যা বর্ণ বা গ্লোয়ারের কারণে হয়নি। তবুও আমি এখানে, বিছানায় পড়ে একটি বৃন্দ উচ্চির মণে মারা যাচ্ছি। কাপুরুষদের চাখ যাতে কখনো শাঙ্কি না পায়।’

এ কথা শুনে খালিদের স্তৰী বলেন-

‘আপনাকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারী) উপাধি
দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহর তরবারী ভাঙ্গতে পারে
না। আর তাই আপনি শহীদ হিসেবে নয় বরং বিজয়ী
হিসেবে মৃত্যুবরণ করবেন।’

আন্তরিক ইচ্ছা স্বত্ত্বেও খালিদ ইবনুল
ওয়ালিদ (রাঃ) তাঁর বিছানায় মৃত্যুবরণ
করেন। অথচ, মু'তার যুদ্ধে খালিদ ইবনুল
ওয়ালিদ (রাঃ) নয়টি তরবারী ভেঙেছিলেন।

কেন? কারণ সেগুলো ছিল খালিদের (রাঃ)
তরবারী। অন্যদিকে, খালিদ (রাঃ) ছিলেন
আল্লাহর তরবারী। তাই তিনি কখনও ভাঙ্গতে
পারেন না। আর এই হলো সেই ব্যক্তি, যিনি
তৎকালের দু-দুটো সুপার পাওয়ারকে
পদানত করেছেন।

আর তিনি তাঁর বিছানায় মৃত্যুবরণ করছেন।
কেন তিনি এটা নিয়ে আক্ষেপ করবেন না?
কেন তিনি শাহাদাত চাইবেন না? শহীদের
মর্যাদা আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা
নিজেই দিবেন। রাসূল (সাঃ) বলেছেন-

“শহীদকে গোমাল দিয়ো না। কেননা গাঁর রক্ত
আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দেবে। গাঁর জামা পরিবর্তন
করো না, কারণ গাঁর জামা আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য
দেবে।”

কেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রাঃ)
শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করবেন না? কেন
তিনি তাঁর রক্তকে সাক্ষ্য হিসেবে চাইবেন
না? বস্তুত, খালিদের (রাঃ) রক্ত, তাঁর জামা
তাঁর শাহাদাতের সাক্ষ্য দিবে না। কিন্তু যারা

এখন পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় শহীদ
হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকে তাঁর জন্য
সাক্ষ্য দিবে। কারণ এমন কোন শহীদ
পাওয়া যাবে না, যিনি খালিদ
সাইফুল্লাহর (রাঃ) দ্বারা প্রভাবিত হননি।
যারা সাইফুল্লাহর (রাঃ) দ্বারা উজ্জীবিত
হননি। বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর ঘোড়া
এবং তরবারী খলিফা উমারের (রাঃ)
কাছে পাঠিয়ে দেন। যখন উমার (রাঃ)
এগুলো দেখেন, তখন তিনি কানায়
ভেঙ্গে পড়েন।

“আবু বকর আমার চেয়ে মানুষকে ভালোভাবে
চিনেছেন। তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের উত্তম
গুণ সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছিলেন।”

এমন কোন লোক পাওয়া যাবে যে
খালিদের (রাঃ) ঘোড়ায় আরোহণ
করবে? এমন কেউ কি আছে যে
খালিদের (রাঃ) তরবারী হাতে নেবে?
না, নেই। কারণ কেউই এই জিনিসের
হক খালিদের (রাঃ) মতো আদায় করতে
পারবে না। বর্ণিত হয়েছে, যখন খালিদ
(রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন তখন বানু
মাখযুমের নারীরা বিলাপ করা শুরু
করেন। আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুবরণ
করার পর আয়িশার (রাঃ) বাড়িতে
নারীরা বিলাপ করছিলো। উমার (রাঃ)
এদেরকে তীব্র ভৎসনা করেন এবং
বিলাপ করার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা
জারি করেন।

କିନ୍ତୁ ସଥିନ ଖାଲିଦ ଇବନୁଲ ଓ ଯାଲିଦେର (ରାଃ) ଜନ୍ୟ ବିଲାପ କରା ହଚ୍ଛିଲୋ,
ତଥିନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉମାରେର (ରାଃ) ନିକଟ ଏସେ ଅଭିଯୋଗ କରଲେନ,

“ତେ ଆମିରଙ୍କ ମୁ’ମିନୀନ! ବାନୁ ମାଧ୍ୟମେର ନାରୀରା ଖାଲିଦେର ଜନ୍ୟ ବିଲାପ କରାଛେ।”

ଜବାବେ ଉମାର (ରାଃ) ବଲଲେନ-

“ତୋମାର ମା ତୋମାକେ ଥାରିଯେ ଫେଲୁକା ଖାଲିଦେର ମଗୋ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ଜନ୍ୟ ଯାରା କାହା କରାଛେ
ତାଦେର କାଁଦିଗେ ଦାଓ। ଓ ଯାଲ୍ଲାହି! ପୃଥିବୀତେ ଆର କୋନ ନାରୀ ଖାଲିଦେର ମଗୋ ପୁରୁଷେର ଜଗ୍ମ
ଦିବେ ନା।”



কুয়াশার চাদর

সিদ্ধিকুর রহমান

ডক্টর আব্দুল

গুলা থেকে পা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়েই
হয়তো লেখাটি পড়ছ। কারণ আজকের
সকালটাও যে গায়ে ছাইরঙ্গা কুয়াশার
চাদর জড়িয়ে রেখেছে!

অথবা একরাশ শুভ্র ধোঁয়ায় নাক ডুবিয়ে
চুমুক দিচ্ছ চায়ের কাপে। চা খেতে খেতেই
তোমার সাথে কিছু আড়ডা দিই চলো..

আচ্ছা, শীতের এই সময়টা তোমার কাছে
কেমন লাগে বলো তো? খুব রুক্ষ-শুক্ষ-
বিদ্যুটে?

হ্যাঁ, কিছুটা তো তা-ই। তার উপর পুরো
বিশ্বব্যাপী করোনার প্রকোপ এখনো সমান
তালে চলছে। ধারণা করা হচ্ছে শীতকালে
এর প্রকোপ আরো বাঢ়বে। আর
সেজন্যেই এই সময়টাতে আমাদের কিন্তু
আরও একটু বেশি সর্তক থাকা উচিত।
তাহলে চলো ঝটপট শুনে নিই শীতের এই
সময়টাতে কী কী করবো, আর কী কী
একদমই করবো না।

এই সময়টাতে অনেকের কাছেই একটি
আতঙ্কের নাম হলো গোসল। এ যেন যুদ্ধ
যুদ্ধ খেলা! তবে তোমরা যারা সচেতন
তারা তো জানোই, গোসল না করাটা
মোটেই ভালো কিছু নয়। এতে করে বরং
শরীরে রোগ-জীবাণু বাসা বাঁধার উপযুক্ত
পরিবেশ তৈরি হয়। তাই গোসল
একেবারেই বাদ না দিয়ে কুসুম গরম
পানিতে গোসল করে নিতে পারো। এতে
করে শরীরের স্বাভাবিক আর্দ্ধতা বজায়

থাকবে আর সারাটা দিন তুমি থাকবে
ফ্রেশ, ফুরফুরে মেজাজে, ইনশাআল্লাহ!

একই ভাবে ওয়ুর ক্ষেত্রেও কুসুম গরম
পানি ব্যবহার করতে পারো। গোসল বা
ওয়ুর পর শরীরে ময়েশারাইজিং লোশন
বা ক্রিম মেখে নেওয়া উচিত। এতে
শরীরের তৃক শুক্ষ হয়ে যায় না। অনেকে
কনফিউশন এ থাকে কোন ব্র্যান্ড ব্যবহার
করবে? কোনটা সবচেয়ে ভালো? এসব
কনফিউশনের কারণ নেই। আমাদের
দেশীয় প্রোডাক্ট গুলোই অনেক ভাল
মানের। যেকোনো একটি ব্র্যান্ড ইউজ
করতে পারো। তবে কোনো নির্দিষ্ট
ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ব্যবহার করার পর যদি
সমস্যার সমুক্তীন হও বা পণ্যটি তোমার
তৃকের উপযুক্ত না হয়, সেক্ষেত্রে সেটি
আর ব্যবহার না করে অন্য ব্র্যান্ড ব্যবহার
করাই ভালো।

অনেকের ধারণা সানক্রিন লোশন
কেবলমাত্র গরমের দিনের জন্য। তবে
শীতের দিনেও কিন্তু রোদের তীব্রতা কম
থাকে না। তাই রোদে বেরোবার সময়
স্ন্তব হলে সানক্রিন লোশন মেখে নিতে
পারো।

ঠোঁটের প্রতি বাড়তি যত্ন নাও। ঠোঁটের
ওপরের তৃক পাতলা হাওয়ায় এর ওপর
শীতের প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি।
অনেকের একটা অঙ্গুত অভ্যাস থাকে।
একটু পর পর জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট
টুকু ভিজিয়ে নেয়। এতে বরং ঠোঁট ফাটার

সন্তোষ আরো বেড়ে যায়। কাজেই জিভ
দিয়ে ঠোঁট না ভিজিয়ে ‘পেট্রোলিয়াম
জেলি’ ব্যবহার করো।

ও, ভালো কথা। শুধু শরীরের বাইরের
অংশের নজর দিলেই কি কাজ শেষ? না!
সুস্থ থাকতে হলে রোজকার খাবারের
মেনুতেও কিন্তু একটু নজর দিতে হবে।
মজার ব্যাপার হলো, আল্লাহ তায়ালা
শীতকালে প্রচুর ফলমূল শাক-সবজি
নিয়ামত দিয়ে আমাদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করার সুযোগ করে দেন,
আলহামদুলিল্লাহ!

তাই মৌসুমি ফলমূল ও শাক-সবজি পর্যাপ্ত
পরিমাণে খেতে হবে। তোমরা কি জানো
যে, মৌসুমি ফলমূলগুলো ঐ বিশেষ
মৌসুমে যে রোগ বালাই হয় তার বিপরীত
অনেক বেশি কার্যকরী?

শীতকালে আমরা অনেক সময় পানি
পানের কথা একেবারেই ভুলে যাই।
যেহেতু এ সময় ঘাম কম হয়, সেহেতু
গরমকালের তুলনায় ‘সামান্য’ পানি কম
পান করলে অসুবিধে নেই। কিন্তু সাবধান
থাকতে হবে পরিমাণটা যের একেবারেই
কম না হয়ে যায়। কারণ তো জানোই, সুস্থ
শরীরের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি কতটা
দরকারী।

আরেকটা বিষয়, আপুরা টুকটাক তুকের
যত্ন নিলেও ভাইগুলো কেন যেন এ
ব্যাপারে একটু ড্যাম-কেয়ার হয়। এমনটা
হওয়া যাবে না, বুঝলে?

না, আমি বলছি না যে, টেলিভিশনের
চটকদার বিজ্ঞাপনে দেখানো জেন্টস
ক্রিম-ফেইসওয়াশ এসব ব্যবহার করতে।
ওসব আসলে খুব বেশি কাজের জিনিস
না। কিন্তু শীতের এই সময়ে তুকের একটু
বাড়তি যত্ন তো নিতেই হবে। এই শীতে
তুকের জন্য অলিভ ওয়েল খুবই কাজের
জিনিস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম এটি ব্যবহার করতেন। এছাড়াও
তুমি সরিষার তেল, কালিজিরা এবং মধু
এসব খাবার অভ্যেস করতে পারো।

এক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার বলে নিই।
যে ভাইয়াদের দাঢ়ি রয়েছে, তারা কিন্তু
কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ পাবে! কারণ
দাঢ়ি পুরুষের মুখের সংবেদনশীল তুকের
জন্য একটা বাড়তি প্রোটেকশন হিসেবে
কাজ করে। দেখলে তো, আল্লাহর রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ
কতটা বৈজ্ঞানিক!

এইরে..! তোমার চা-তো একদম জুড়িয়ে
গেল!

আজকের মত আমি যাই। আল্লাহ চাইলে
আবার কোন একদিন আড়ডা হবে।
ততদিন শরীরের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি
ঈমানের যত্নটুকুও নিয়ো। আসসালাম
আলাইকুম।

সুলতান রূক্মিণি বাইবাস দ্যা প্যাথার



মাওলানা গোলাম রুবানী

প্রবাদ আছে, ‘যে জাতি নিজের ইতিহাস জানে না সে দুর্বল এবং অন্যের গোলাম হয়ে কালাতিপাত করে।’

বাস্তবেও আমরা তাই দেখতে পাই। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার বিকল্প নেই। কিশোর থেকে আমাদের উচিত দৈনন্দিন পাঠ্য তালিকায় ইতিহাস রাখা। বিশেষ করে আমাদের মুসলিম হিরোদের জীবনী পড়া (অমুসলিমদের জীবনীও জানার জন্য পড়া যেতে পারে, আদর্শ হিসেবে নয়)। মুসলিম মনীষীদের নাম যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে দেখা যাবে নির্দিষ্ট কিছু নামই সকলের মুখে আসবে। যাদের নাম আমরা সচারাচর শুনে থাকি। এটা দোষের নয়। তবে আমাদের সকলের উচিত এর বাইরেও যারা আছেন তাদের জীবনী পড়া। অনেক এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাদের অবদানের তুলনায় আলোচনা খুবই সামান্য। যাদেএকটির জীবনীতে আমাদের জন্য আলো থাকলেও আলোচনা ও চিন্তাশীল পাঠের অভাবে আজ তা কুয়াশায় ঢাকা। এমন অনেকের মাঝে একজন হলেন সুলতান রূকনুদ্দিন বাইবার্স, যাকে ক্রুসেডাররা ‘দ্য প্যান্থার’ নামে ভূষিত করেছিল।

তিনি মুসলিম ইতিহাসের বীরশ্রেষ্ঠদের অন্যতম অধীশ্বর। একাই নেতৃত্ব দিয়েছেন দুই পরাশক্তি ক্রুসেডার ও তাতারদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধের ময়দানে হোক বা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই হোক, উভয় দিক দিয়েই ক্রুসেডারদের পরাজিত করেছেন। সারা পৃথিবী যখন তাতার তাওবে অতিষ্ঠ, তখন তিনি এবং সুলতান কুতুজ চূর্ণ করেছেন তাতারদের দণ্ড। সুলতান বাইবার্স ছিলেন কঠোর স্বভাবের। কাফিরদের কুটকৌশল সহজেই ধরে ফেলতেন এবং শক্তভাবে দমন করতেন। কাফিরদের জন্য তার মনে দয়া বা করুণার স্থান ছিল না। অপরদিকে নরম ও সদয় ছিলেন মুসলিমদের জন্য। এ যেন কুরআনের আয়াত “কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরম্পরে সহানুভূতিশীল” (اشدء على) (الكافر رحماء بينهم) এর বাস্তব চিত্র। একইসাথে তিনি মুসলিম সীমান্তকে নিরাপদ করে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছেন সর্বত্র। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'য় তিনি ছিলেন অগ্রগামী।

★ জন্ম থেকে আইয়ুবী সালতানাতে : সুলতান রূকনুদ্দিন বাইবার্স ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান কাজাখস্তানের কিপচান নামক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের কয়েক বছর পূর্বেই তাতারদের আগ্রাসন শুরু হয় মুসলিম ভূখণ্ডে। বাইবার্সের ১৪ বছর বয়সে তাঁর জন্মভূমিতে তাতাররা আক্রমণ করে বসে। বন্দী হন বাইবার্স। সুলতান নাজিম উদ্দিন আইয়ুবীর সেনাপতি আলাউদ্দিন আইতাকিন বাইবার্সকে হামারাহ দাসবাজার থেকে কিনে মিশরে নিয়ে আসেন। এর মধ্য দিয়েই তিনি প্রবেশ করেন আইয়ুবী সালতানাতে। মামলুকরা সেখানে কঠোর প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠতো

যুদ্ধনীতি ও পড়াশোনায় বাইবার্সের সফলতা দেখে দ্রুত তাকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়। ধীরে ধীরে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠ হন।

★ স্পেশাল ইউনিটে মনোনয়ন : দুই পরাশক্তির বাহিরে ইসলামী রাষ্ট্রের গলার তৃতীয় কাঁটা ছিল এসাসিন নামক শিয়া গোষ্ঠী। তাদের গুপ্তহত্যা থেকে সুলতান, প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি কেউই নিরাপদ ছিল না। সুলতান আস-সালিহ এই ফেদাইনদের থেকে নিরাপত্তার জন্য দেহরক্ষী হিসেবে স্পেশাল এক ইউনিট গঠনে উদ্যোগী হন। আর এই চিমের জন্য মামলুকদের নিয়োগ দেন। কেননা তারা তখন আইযুবী বাহিনীর চেয়ে অত্যাধিক কর্ম্ম, সাহসী ও নিষ্ঠাবান ছিল। ১৯৪২ সালে মাত্র উনিশ বছর বয়সে সেরা সাতাশ জনের একজন হয়ে তরুণ বাইবার্স এই রেজিমেন্টে মনোনীত হন। সদস্য হন আইযুবী সেনাবাহিনীর স্পেশাল মামলুক ইউনিটে।

জিহাদের ময়দানে বাইবার্সের অবদান নিয়ে আলোচনায় তিনটি দিক সামনে আসে। ক্রুসেড, মঙ্গোল ও শিয়া গুপ্তघাতকদের সাথে সংঘাত।

★ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সুলতান বাইবার্স : ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাইবার্সের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় মানসুরা যুদ্ধ। প্রতিপক্ষ সপ্তম ক্রুসেডের নেতৃত্বে থাকা রাজা (নবম) লুই। রাজা লুই ছিল ধার্মিক খ্রিষ্টান। আশাহত ইউরোপ তাকে নিয়ে দেখছিল নতুন স্বপ্ন। ১২০ টি জাহাজে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন তিনি। যাদের মাঝে ছিল ৩০০ নাইট। আসার সময় ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে অবস্থিত দিময়াত নামক বিশাল বন্দরনগরী দখল করে নেয় তারা। সংবাদটি সুলতান নাজিমউদ্দিনকে ব্যথিত করে। তিনি তখন বুঝতে পারেন ক্রুসেডাররা এবার মিশরের দিকে অগ্রসর হবে। অথচ তিনি খুব অসুস্থ। তবুও সেনাবাহিনীর সাথে মনসুরা যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। এদিকে মাত্র ২৭ জন সৈন্য নিয়ে যাত্রা শুরু করা মামলুক রেজিমেন্টের সংখ্যা তখন ১০ হাজারে গিয়ে ঠেকেছে। সাহসিকতা, ক্ষিপ্ততা ও উন্নত প্রশিক্ষণের কারণে এরা এখন আইযুবী বাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ রেজিমেন্ট। যুদ্ধের আগে সুলতান নাজিমুদ্দিন আইযুবের ইন্তেকাল হলে তার স্ত্রী শাজারাতুত দূরের পরিকল্পনায় মৃত্যুসংবাদ গোপন রেখে সৈন্যদের মনোবল শক্ত রাখেন তিনি। ৪ ফেব্রুয়ারি মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হল উন্মাদ ক্রুসেডারদের। কয়েক ধাপে চলতে থাকা এই যুদ্ধে হাজার হাজার ক্রুসেডার নিহত হয়। বন্দী হন রাজা লুই। আবারো আশাহত হয় ইউরোপ। অভাবনীয় এই বিজয়ের নায়ক ছিলেন সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স।

খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের পরিস্থিতি ছিল তাতারীদের থেকে অনেকটা ভিন্ন। তাই তাদের প্রতিরোধ করার কাজটা খুব সহজ ছিল না। খ্রিষ্টানরা এলাকা দখল করে তার চারপাশে।

শক্ত প্রাচীর নির্মাণ করে প্রতিরক্ষার জন্য উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য নিরোজিত করত। যাদের নাইট বলা হতো। তাদের দমন করতে সম্মুখ লড়াইয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অবরোধের মাধ্যমে তাদের দুর্বল করা। পুরো লেভান্টে (আধুনিক ইসরাইল, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন ও তুরস্ক) তখন তিনটি ক্রুসেড রাজ্য ছিল। এন্টিয়ক, কিংডম অফ ত্রিপোলি, কিংডম অব জেরুসালেম।

১২৬০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে বাইবার্স নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন। এরপরে তাতারদের থেকে যুদ্ধের ডাক আসে। ১২৬৩ থেকে তিনি খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ লড়াইয়ে ময়দানে নামেন। প্রথমেই তিনি বাযতুল মাকদিসের দিকে রওনা করে অঙ্কা অবরোধ করেন। পর্যায়ক্রমে আরফুস, আতলিত, হাইফা, কায়সারিয়া জয় করে সাফাদ নগর অবরোধ করেন। এখানে দুই হাজার নাইট উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বাইবার্স আতঙ্কে আত্মসমর্পণ করে। এভাবেই কিংডম অব জেরুসালেম রফাদফা করে ১২৬৮ খ্রিস্টাব্দে আরেক ক্রুসেড রাজ্য এন্টিয়ক অভিযান পরিচালনা করেন। অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করে জনগণ। কিছু ক্রুসেডার আত্মসমর্পণের অস্বীকৃতি জানিয়ে যুদ্ধের চেষ্টা করলে লড়াইয়ে প্রায় ১৬ হাজার ক্রুসেডার মারা যায়।

এন্টিয়ক পতনের পর ভীত হয়ে পরে আশপাশের ক্রুসেড রাষ্ট্রগুলো। নিজেদের ক্ষমতা আর শহর রক্ষায় শেষ চেষ্টায় তারা ঘোষণা করে ক্রুসেডের। সিদ্ধান্ত হয় সম্মিলিত আক্রমণে। তাতার, ইংল্যান্ডের যুবরাজ, সাইপ্রাস রাজা ও থাকবে ফ্রান্সের রাজা। তিনি দিক থেকে মামলুক সাম্রাজ্যে আক্রমণ করবে। তাতারদের থেকে শক্তিশালী সাহায্য আসবে। যুদ্ধে থাকবে হালাকু খানের পুত্র আবাগা খান। তিনি দিকের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে যাবে বাইবার্স। অপরদিকে সুলতান বাইবার্স জানতেন না অষ্টম ক্রুসেড ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। সেবার আল্লাহর সাহায্য সরাসরি প্রত্যক্ষ করে মুসলিম বিশ্ব। ফ্রান্সের রাজার বাহিনী নিয়ে তিউনিসিয়ার বন্দরে পৌঁছার পর পেটের মহামারী দেখা দিলে রাজা এবং তার পুত্র মারা যায়। ফিরে যায় বাহিনী। অবস্থা দেখে অন্য বাহিনী মাঠেই নামেন। যুদ্ধ ছাড়াই শেষ হয় অষ্টম ক্রুসেড।

অবশিষ্ট কিংডম অফ ত্রিপোলি অবরোধ করেন বাইবার্স। আবারো দেয়া হয় ক্রুসেডের ডাক; ক্রুসেডারদের রণতরী ফিলিস্তিন পৌঁছালে শুরুতে মামলুকদের কিছু অঞ্চল হাতছাড়া হওয়ার সংবাদ শুনে বাইবার্স দ্রুত ময়দানে চলে আসেন। বাইবার্সকে দেখেই মনোবল হারিয়ে ফেলে ক্রুসেডাররা। ১২৭২ সালের মে মাসে তারা আত্মসমর্পণ করে। অপমানজনক সন্ধির মাধ্যমে ক্রুসেডারদের পরাজিত করেন বাইবার্স। এভাবেই সুলতান বাইবার্স এর মাধ্যমে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো থেকে স্থায়ীভাবে বিতাড়িত হয় ক্রুসেডাররা। ক্রুসেডের ইতিহাসে সুলতান বাইবার্স-ই সব থেকে বেশি ক্রুসেডার হত্যাকারী।

★ তাতারদের মোকাবেলায় সুলতান বাইবার্স : সত্যই তাতারীদের ইতিহাস এক বিস্ময়কর ইতিহাস। খুব অল্প সময়ে একটি জাতি পৃথিবীর পরাশক্তিতে পরিণত হয়। তারা ছিল সংখ্যায় অনেক। দখলকৃত ভূমি, জুলুম অত্যাচারেও তাদের ইতিহাস বিস্ময়কর।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাতারীদের আক্রমণে জন্মভূমি থেকে বিক্রি হন বাইবার্স। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাতারদের হাতে পতন হয় বাগদাদের। এর পরপরই হালাকু খানের পত্র আসে মিশরে। তাতার ভয়ে বিশ্ব এমনকি মুসলিমরাও এত ভীত ছিল যে, কারোর সাহস হত না সামনাসামনি দাঁড়ানোর। অসহায় আত্মসমর্পণ ছিল তাদের লাঞ্ছিত বিজয়। কারণ তাতাররা ছিল অপরাজেয়। পরাজিত হয়নি কারো কাছেই। কিন্তু সাইফুন্দিন কুতুজের ইচ্ছে ছিল দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়ার। তাকে সমর্থন জানায় সেনাপতি বাইবার্স। বাইবার্সের পরামর্শে তাতার দৃতদের হত্যা করে সমরের সাক্ষাৎ চূড়ান্ত করে দেয়া হয়। ক্রোধের আগ্নে উন্মাদ হয়ে পড়ে তাতাররা। মামলুকরাও নিল যুদ্ধের প্রস্তুতি। নেতৃত্বে ছিল সুলতান কুতুজ ও সেনাপতি বাইবার্স।

তাতাররা গান পাউডার মেশানো ২০ ফুট লম্বা তীর নিক্ষেপ করতো। যা ছিল খুবই আতঙ্কের। বিপরীতে সেনাপতি বাইবার্স আবিষ্কার করেন হাত কামান মিদফা। তাতার যুদ্ধেই হবে তার প্রথম ব্যবহার।

১২৬০ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর আইনে জালুত প্রান্তরে (যেখানে দাউদ আলাইহিস সালাম-এর হাতে জালুত নিহত হয় তাকে আইনে জালুত বলে) ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে আসা তাতারিদের মুখোমুখি হয় ১ লাখ ১০ হাজার সৈন্যের বিশাল মুসলিম বাহিনী। সৈন্যের বিবেচনায় মুসলমানরা বেশি হলেও মামলুক ও মিশরীয়রা ব্যতীত সব ছিল তাতার ভয়ে ভীত। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তাতাররা এগিয়ে ছিল শুরুতে। অবস্থা দেখে দ্রুত নেমে আসেন সুলতান ও সেনাপতি। সুলতানের আহ্বানে চেতনা ফিরে আসে মুসলমানদের। মামলুকদের জোরালো আক্রমণে পাল্টে যায় যুদ্ধের চিত্র। পালাতে শুরু করে তাতাররা। সুলতানের আদেশে বাইবার্স সাড়ে চারশো কিলোমিটার ধাওয়া করে প্রায় সকল তাতারকে হত্যা করে। জয়ী বেশে মিশরে ফিরে যায় মুসলমানরা।

বাইবার্স সুলতান হওয়ার পর ১২৬২ সালে ময়দানে আবার প্রতিশোধ নিতে আসে হালাকু খান নিজেই। মুখোমুখি হয় ইতিহাসের সেরা দুই জেনারেল। প্রচন্ড যুদ্ধের এক পর্যায়ে মামলুক সেনারা পালানো শুরু করে, কৌশল বুঝতে না পেরে তাতাররা আনন্দিত হয়ে পড়ে। আচমকা পাল্টা আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে হালাকু খানের বাহিনী। চরম শিক্ষা নিয়ে ফিরে যায় হালাকু খান। সে বুঝতে পারে যুদ্ধ কৌশলসহ সকল ক্ষেত্রে এরা পরিচিত মুসলমানদের থেকে ভিন্ন।

এরপর ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে পরাজয় এবং শেষে ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাতাররা সালজুক সালতানাতের সাথে মিলে বাইবার্সের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে নামে। কিন্তু এলবিস্তান নামক জায়গায় শোচনীয় পরাজয় নিয়ে ফিরে যায় জোটবাহিনী। মুসলমানদের অন্তর থেকে তাতার আতঙ্ক একদম মুছে দেয়ায় সুলতান বাইবার্স-এর ভূমিকা রয়েছে অন্যতম।

★ এসাসিন গুপ্তবাতক মূলোচ্ছদে সুলতান বাইবার্স : পারস্যের এক শিয়া হাসান বিন সাবাহ'র হাত ধরে এ দলের যাত্রা। এদের জঘন্য কাজের একটি ছিল মুসলমানদের বিপক্ষে ত্রুসেডার ও তাতারদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা। তবে এরা পারদশী ছিল গুপ্তহত্যায় এবং পরিচিতও ছিল গুপ্তবাতক হিসেবেই। এই কাজে এতই পারদশী এবং ভয়াবহ ছিল যে, অনেক মুসলিম খ্যাতনামা ব্যক্তি এদের হাতে নিহত হয়। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপরও এরা দু'বার আক্রমণ করে।

এসাসিনদের একটি দুর্গ ছিল ইরানে যা হালাকু খান উপরে ফেলে। অপর ঘাঁটিটি ছিল সিরিয়াতে। ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে বাইবার্স নজর দেন এসাসিন দুর্গের দিকে। তারা শক্তিশালী দুর্গ তৈরি করে রেখেছিল। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী রাহিমাভল্লাহ একবার অবরোধ করেন, কিন্তু মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়নি। এই বিষবৃক্ষের মূল উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে অবরোধ শুরু করেন সুলতান বাইবার্স। প্রথমেই তিনি আদেশ জারি করেন এই মর্মে যে, ‘মুসলিম হোক বা শিয়া অথবা খ্রিস্টান কেউ যেন এসাসিনদের কাছে এক কণা খাদ্যশস্য বিক্রি না করে। কেউ যদি এমন দুঃসাহস দেখায় তাহলে তার জন্য গোটা এলাকা ধ্বংস করে দেয়া হবে।’

৪১৯১ বর্গকিলোমিটার ভূমিতে মোট ১৯ টি শক্ত দুর্গ ছিল এসাসিনদের। সুলতান বাইবার্সের অকল্পনীয় সেনাবিন্যাস ও পরিকল্পিত অবরোধে সবকটি দুর্গ তিনি দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এমনভাবে দাঁড় করাতেন যাতে দুটি বাহিনী একসাথে দুই দুর্গের দিকে নজর রাখতে পারতো। মামলুকদের অঙ্গুত রণকৌশলের চাপায় পালানোর রাস্তা খুঁজছিল এসাসিনরা। অবরোধ চলাকালে বাইবার্স অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার পরিচয় দেন। খারাপ সংবাদ শোনামাত্রই এক দুর্গ থেকে অন্য দিকে ছুটে যেতেন দ্রুততার সাথে। মামলুকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মাত্র এক বছরে ১২৭১ সালে সবগুলো দুর্গের পতন ঘটে। হাতেগোনা কয়েকজন ব্যতীত সকল ফিদাইন নিহত হয়। এভাবেই বিশ্বকে অতিষ্ঠ করা এই গুপ্তবাতকদের চিরতরে বিদায় করার গৌরবটাও তিনি আল্লাহর সাহায্যে অর্জন করেন।

★ বাইবার্সের একটি মহৎ গুণ : বাইবার্স কাফিরদের প্রতি যেমন কঠোর ছিলেন, মুসলমানদের প্রতি তেমনই কোমল ছিলেন। কৌশলী ও শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজ্য বিস্তৃতির জন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রে আক্রমণ করেননি। তিউনিশিয়ার সুলতান প্রথম

মোহাম্মদ খিস্টানদের সাথে সর্বদা মিএতা বজায় রেখে চললেও বাইবার্স তাদের রাজ্যের উপর আক্রমণ করেননি কারণ তার সামনে ছিল ক্রুসেডার, তাতার আর এসাসিনদের মতন বড় বড় শক্তি। ১২৭৭ খিস্টানে সালজুক-মোঙ্গল মিলে বাইবার্সের বিপক্ষে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আনাতোলিয়া আসে। দু'জন মুসলিম সুলতান ১০ হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে মোঙ্গলদের। অবাক কান্ত হলো, এই মুসলিমরা কিছু অঞ্চলে লুঠন ও তাঙ্গৰ চালিয়ে আসতে থাকে। মোঙ্গল শাসিত সালজুকদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে বের হন বাইবার্স। তাই সালজুক সীমান্তে যেয়ে ঘোষণা দেয়া হয়, “সুলতান বাইবার্সের এই অভিযান মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে। তাই কোন মুসলিম যেন মামলুকদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার না ধরে। মুসলিমরা মামলুকদের বিরুদ্ধে না গেলে তাদের ক্ষমা করা হবে।”

সম্মিলিত এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আবাগা খান। তুমুল যুদ্ধ শেষে মামলুকরা বিজয়ী হয়। তবে মোঙ্গলদের তুলনায় মামলুকদের তরবারী মুসলমানদের উপরে বেশি চালিত হয়।

★ সমালোচিত কিছু কর্মকাণ্ড : ইসলামের ইতিহাসের সেরা নায়কদের একজন হওয়া সত্ত্বেও কিছু কাজ তার জীবনে স্থলন এর মতই লেগে গিয়েছে। একটি হলো, আইন জালুতের প্রায় ৫০ দিন পর সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজকে হত্যা করা। তার এই কাজের পর মামলুকরা হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের নোংরা খেলা শুরু করে। হত্যার পর তিনি নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন। হত্যার কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিভিন্ন কথা রয়েছে। তবে আমাদের উচিত, তার ভুলকে ভুল হিসেবে স্বীকার করা। এর জন্য আল্লাহ যেন তাকে ক্ষমা ক্ষমা করেন সেই দু'আ করা এবং তার অবদানের জন্য তাকে উত্তম প্রতিদান দেন সেই দু'আ করা।

★ শিক্ষা ও সামাজিক কাজে সুলতান বাইবার্স : যুদ্ধের ময়দানের পাশাপাশি আলিমদের শিক্ষা, পরামর্শ নেয়া, অর্থনৈতিক বিষয় লক্ষ্য রাখা ও জ্ঞানের প্রসারেও সুলতান নজর দিয়েছেন। ১২৬২ সালে মাদরাসার সাথে বিশাল কুতুবখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৭৭ সালে একই নামে দামিক্ষে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। দামিক্ষে প্রতিষ্ঠা করেন দারুল হাদিস নোরিয়া নামে বিশাল মাদ্রাসা। এ সকল মাদ্রাসার সাথে এতিমদের জন্য পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। দরিদ্রদের বিষয়েও তিনি লক্ষ্য রাখতেন, প্রতিবছর দরিদ্রদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ রাখতেন। রমযানেও মানুষকে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। তারই নির্দেশে নির্মাণ করা হয় বহু মাসজিদ।

★ মৃত্যু ও সমাধি : দীর্ঘ যুদ্ধজীবন শেষে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে সুলতান দামিক্ষে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেখানে অবস্থানকালে ১২৭৭ খিস্টানের ১ জুলাই তিনি ইন্তেকাল করেন। জানা যায়, পানীয়তে বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করা হয়। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে ১৭ বছর

মামলুক সাম্রাজ্য শাসন করা অবস্থায় তিনি ইন্টেকাল করেছেন। বাহারি মামলুকদের সেনাপ্রধান ছিলেন ৩৩ বছর ঘাবত। সিরিয়ার মাকতাবাতুয় জাহিরিয়া মাদ্রাসার মসজিদ চতুরে সুলতানকে দাফন করা হয়।

অপরাজেয় এই সুলতানকে তার বিচক্ষণতা ও ক্ষিপ্তার কারণে নানানজন নানা উপাধি দিয়েছেন। খিলান ক্রুসেডারদের চোখে তিনি ছিলেন দ্য প্যান্থার, কারো কাছে কায়রোর বজ্র, আসাদুল মিশর। নিজের পরিকল্পনা ও পদক্ষেপের কথা কাউকে বুঝতে দিতেন না। আচমকা আঘাত হানতেন শত্রুর দুর্বল জায়গায়। তাকে কখনো আতঙ্কিত করতে পারেনি বিশ্বগ্রাসী মঙ্গেলরা। বাইবার্সকে তুলনা করা হয় সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে। তবে বাইবার্সের নীতি ছিল আইয়ুবী থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে কঠোর। তাই অনেকে তাকে দ্বিতীয় সালাউদ্দিন বলে। তিনি হাত কামাল মিদফা আবিঞ্চির এবং মামলুকদের ভিন্নরকম তরবারী কিলিজ চালনায় পারদশী ছিলেন। এছাড়াও সুলতানের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি যে'কটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন তাতেই মুসলিম শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। আল্লাহ তার ভুল ক্রটি ক্ষমা করে তাকে জান্মাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র :

১. ইসলামি ইতিহাস, মাকতাবাতুল হাসান (পঃ: ২৫৫-২৭৬)
২. দ্য প্যান্থার। ইমরান আহমাদ, কালান্তর প্রকাশনী।
৩. ইতিহাসের পাতা (পিডিএফ) ইমরান রাইহান, (পঃ: ১৫৭-১৬৫ ও ৫১৯-৫৩০)
৪. তাতারিদের ইতিহাস, ড. রাগিব সারজানী, মাকতাবাতুল হাসান।

খুলি মেঘের ভাঁজ (২য় পর্ব)

ওমর আলী আশরাফ

আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়তে
লাগলাম। কেউ সাড়া দেয়, কেউ এড়িয়ে
যায়। হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল করলাম,
একটি গাছের নিচে কয়েকটি বাচ্চা খেলাধুলা
করছে। ছেঁয়াছুঁয়ি খেলা। যাকে ছুঁয়ে দেওয়া হয়,
পরবর্তীতে তার পালা। সে ছুঁয়ে দেবে অন্যজনকে।
খুব মজার খেলা। ওদের চেয়ে বয়সে একটু বড়
একটি ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
খেলা দেখছে আর মুখ টিপে হাসছে।
আমরা কাছে গিয়ে সালাম দিলাম,
'আসসালামু আলা মানিত তাবাআল হুদা!'

আমাদের ধর্ম সবাইকে সালাম দেওয়া শেখায়।
সালাম তো অভিবাদন। শান্তি বর্ষণের দুআ।
জান্মাতের বাসিন্দারা একে অপরকে 'সালাম'
বলে অভিবাদন জানাবে। আমরা
মুসলিমরা পরম্পরে 'আসসালামু আলাইকুম
ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে শান্তি বর্ষণের সম্ভাষণ
জানাই। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে আর এটা থাকে
না, তখন আমাদের বলতে হয়
'আসসালামু আলা মানিত তাবাআল হুদা'।
এর মাধ্যমে আমরা তাদের হিদায়াত কামনা করি।
এটাই অন্যদের ক্ষেত্রে উত্তম অভিবাদন।
আল্লাহ হিদায়াত না দিলে, তারা
ইসলাম গ্রহণ না করলে, ঈমান ছাড়া মৃত্যুবরণ
করলে চিরদিনের জন্য জাহানামের আগুনে জ়ৃলতে
হবে। এজন্য সবার প্রতি আমাদের মনে
হিদায়াতের কামনা থাকা উচিত।

ছেলেটি আমাদের সালামের শব্দে চমকে
তাকাল। বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ।
এদেশের বাসিন্দা হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সবাই জানে
সালাম মানে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া
রাহমাতুল্লাহ'। আমরা এই অজ পাড়াগাঁয়ে যখন
হিন্দুদের 'আসসালামু আলা মানিত তাবাআল
হুদা' বলে সম্ভাষণ জানাচ্ছি, সবাই চমকে তাকাচ্ছে।

এই আবার আরবিতে
কী বলল হ্যুরেরা! ছেলেটা জিগ্যেস করল,
'আপনারা যেটা বললেন, তার অর্থ কী?'
আমরা বললাম, 'এর অর্থ খুব সুন্দর। শান্তি
বর্ষণ হোক তার ওপর, যে হিদায়াতের
অনুসরণ করে। হিদায়াত মানে সৎপথ।
সৎপথ আসলে কী, সেটা বোঝানোর জন্যই
আমরা ঢাকা থেকে ছুটে
এসেছি তোমাদের এই গ্রামে।'

কথায় কথায় আমরা জানতে পারলাম,
ছেলেটির নাম কল্লোল দাশ। দশম শ্রেণিতে
উঠবে এবার (২০১৪ সালের ঘটনা)।
জানার আগ্রহ প্রবল।
বেশি আগ্রহ হ্যরত উমর রায়িয়াল্লাহ
আনহুকে নিয়ে। ইসলামের সবচেয়ে বড়
শক্রদের একজন কী করে খলিফাতুল
মুসলিমিন হয়ে গেলেন,
ব্যাপারটায় সে ভীষণ ইস্পেসড।

কল্লোল দাশ বলল, 'আপনারা ঢাকা থেকে
এসেছেন হ্যুর? আপনাদের কাছে আমার
অনেক প্রশ্ন আছে।'

'বলো, দেখি!'

'আমাদের পাঠ্য বইতে তো অল্প কিছু ঘটনা
থাকে, বিস্তারিত থাকে না। আমাদের বইতে
পড়েছি হ্যরত উমর রায়িয়াল্লাহ আনহু
ছিলেন মহান বীর। প্রথম জীবনে তিনি
ইসলামের ঘোর শক্র ছিলেন। আমরা হিন্দু;
কিন্তু ইসলামের শক্র না। তিনি ইসলামের
বড় শক্র থেকে মুসলিম
জাহানের দ্বিতীয় খলিফা কীভাবে হলেন?'

আমি কল্লোল দাশের দিকে তাকালাম। বয়স
কত? পনেরো অথবা ষোলো।

একদম তোমাদের বয়সী। তার মনে জানার যে
তোলপাড় আগ্রহ,
আমাদের অনেকেরই তা নেই। আমি মনে
লজিত হলাম।

একটি জন্মগত হিন্দুধর্মের ছেলে ইসলামের
সবচেয়ে ভয়াবহ রাগী এবং দুর্দান্ত সাহাবি ও
খলিফার সম্বন্ধে যে সবিনয়ে জানতে চাচ্ছে, নামটা
কত সুন্দর করে উচ্চারণ করেছে—হযরত উমর
রায়িয়াল্লাহু আনহু—আমার নিজের নাম উমর
হওয়া সত্ত্বেও তার মতো করে ভীষণ ত্বক্ষার
চাহনি নিয়ে কখনো জানতে চেয়েছি কি না, মনে
পড়ে না। ‘শোনো, হযরত উমর রায়িয়াল্লাহু আনহু
বীর ছিলেন। যারা বীর, তারা সত্যের সন্ধান
পেলেই সানন্দে গ্রহণ করেন। তারা
জানেন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বিপরীতে
গিয়ে সত্যটা গ্রহণ করলে সবাই শুধু তাকে
ত্যাগই করবে না, আক্রমণও করতে পারে। উমর
রায়িয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বীর, বুকভরা তার
অসীম সাহস, এজন্য সত্যের সন্ধান পাওয়া-মাত্র
তিনি অনায়াসে লুফে নিলেন। সত্যকে এড়িয়ে
চলে ভীতুরা, সত্যের সামনে মাথা নোয়ায় না
বোকারা, সত্যের মুখোমুখি হয় না কাপুরুষেরা,
উমর রায়িয়াল্লাহু আনহু তাদের মতো ছিলেন না।
নবীজিকে হত্যা করতে গিয়ে

বীর।’ মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল সে।

ততক্ষণে আকাশে ভাসতে থাকা মেঘের
থলে ফুটো হয়ে গেছে।
ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। বড় বড় ফোঁটা।
আমরা গাছের
নিচে আশ্রয় নিলাম। কল্লোল দাশের জানার
আগ্রহ তখন চূড়ায়।
সে আমাদের বলল, ‘ভিজে যাচ্ছেন তো,
আমাদের বাড়িতে চলুন।
এই বাড়িটাই আমাদের। চলুন চলুন, আরও
অনেককিছু আমার
জানার আছে।’ কল্লোল দাশের আহ্বানে
আমরা ইতস্তত করছিলাম।
আমাদের নিয়ে যাওয়ার কারণে তারা বাবা-
মা তার ওপর চটে
যাবে না তো!

কল্লোল দাশ বয়সে কিশোর; কিন্তু বুদ্ধি
তার অনেক। আমাদের
চোখ চাওয়াচাওয়ি দেখে সে বুঝে ফেলল।
ততক্ষণে আমরা
অনেকটা ভিজে গেছি। কল্লোল দাশ
আমাদের হাত ধরে টানতে
টানতে বলল, ‘আমার বাবা, মা, চাচা সবাই
অনেক ভালো,
কেউই কিছু মনে করবে না।

আপনারা চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো ভিজে যাবেন!’

আমাদের একজন বললেন, ‘একটু পরেই কিন্তু আসরের নামায়ের আজান হবে, আমাদের তো নামায পড়তে হবে!’

কল্লোল দাশ স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, ‘নামায়ের সময় হলে দেখা যাবে। ব্যবস্থা করে দেব। এখন আগে আমাদের বাড়িতে চলুন।’

আমাদের সবার পরনে জুবু। একজনের মাথায় আবার শাদা পাগড়ি। বৃষ্টিতে আমাদের শাদা জুবু ভিজে গায়ে মাখছিল শীতল শিহরণ। একটি হিন্দু-বাড়িতে ঢুকছি তাদের কিশোর ছেলেকে ঈমানের কথা শোনাতে, কেউ রেগেমেগে তেড়ে এলে কীভাবে সামাল দেব, এটা ভাবতে ভাবতে আমরা উঠে দাঁড়ালাম কল্লোল দাশদের ভেতর-বাড়ির দহলিজে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুনশী মেহেরপ্পাহ : বিস্মৃত ও নিবেদিতপ্রাণ দান্তি ইলাম্প্রাহ ও সমাজসংস্কারক



-আল আমীর

“ভাব মন দমে দম রাহা দূর বেলা কম”

যশোর সদর উপজেলার মেহেরুল্লাহ
নগর রেল স্টেশনের অদূরে একটি
কবরের নামফলকে উপরোক্ত চরণটি
অংকিত রয়েছে। কবরটি কর্মবীর মুনশী
মেহেরুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর।

আমরা খুব সহজে যেসব কীর্তিমান
মানুষকে ভুলে যেতে বসেছি, মুনশী
মেহেরুল্লাহ তাঁদের অন্যতম।
উপমহাদেশে মুসলমানদের বৃদ্ধিবৃত্তিক
অসহায়ত্ব ঘোচাতে তাঁর কর্মতৎপরতা
আমাদের জন্যে কেবলই মুন্দতা ও
অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। এই আলোকিত
মানুষটির বিস্ময়কর জীবন ও কর্ম
বিস্মৃতির অতলে হারাতে চলেছে।

জাতি হিসেবে ইতিহাস চর্চা ও
সংরক্ষণের প্রতি আমাদের এমনিতেই
কোন দায়বোধ নেই, তার ওপর
আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের
চেতনাকে ধারণ ও লালন করে
ভবিষ্যতের পথরেখা অঙ্কনের চিন্তাও
এখন বিরল। ভারতীয় উপমহাদেশের
মুসলমানদের গর্ব ও অহঙ্কার মুনশী
মেহেরুল্লাহ তেমনই একজন বিস্মৃত
বিস্ময়।

মুনশী মেহেরুল্লাহ ব্রিটিশ বাংলার
অন্যতম বাগী, ইসলাম প্রচারক ও
সমাজসংস্কারক ছিলেন। মেহেরুল্লাহ
১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর বৃহত্তর
যশোর জেলার (বর্তমানে ঝিনাইদহ
জেলা) কালীগঞ্জ উপজেলার ঘোপ
গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ
করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস যশোর
সদর উপজেলার ছাতিয়ানতলা গ্রামে।
যশোর শহরে সামান্য দর্জির কাজ
করে জীবকা নির্বাহ করতেন। এ
সময় খিষ্টান পাদ্রিরা ইসলাম ধর্ম
বিরোধী প্রচারে এবং ইসলামের
কৃৎসা রটনায় তৎপর ছিল।

মুনশী মেহেরুল্লাহ মুসলমানদের
বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য কী
কী করেননি? মুনশী মেহেরুল্লাহর
পরিচয় তাঁর কর্মে। এ কারণেই তিনি
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা ও
পেশাগত জীবনের দৈন্য জয় করতে
পেরেছিলেন। রাজশক্তির বলে
বলিয়ান খিষ্টানদের ধর্ম প্রচারের নামে
ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার
রোধে তিনি সর্বত্রই যুক্তি নিয়ে হাজির
হয়েছেন। বিভ্রান্তির অন্ধকার দূর

করেছেন। লেখনী, বাগিচা আর ক্ষুরধার যুক্তির অনল বর্ষণে মিশনারিদের সব অপতৎপরতার জবাব দিয়েছিলেন তিনি।

দুটো উদাহরণ দিচ্ছি:

খ্রিস্টান পাদ্রীদের পক্ষ থেকে একটি বাহাসে প্রশ্ন করা হল, ‘ইসলাম ধর্ম মতে জান্মাত হলো ৮টি এবং জাহানাম হলো ৭টি। এটা নিতান্তই হাস্যকর কথা। কারণ, আপনারাই বলেন মুসলমানরা ব্যতীত আর কেউ জানাতে যাবেনা। কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমানদের বিপরীতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই বেশি। আবার বলছেন, মুসলমানদের মধ্যেও সবাই জানাতে যাবেনা। খাঁটি ঈমানদারেরাই যাবে কেবল। দেখেন, তাহলে এই গুটিকয়েক মানুষের জন্য ৮টা জান্মাত আর বিপরীতে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের জন্য ৭টা জাহানাম! এর চেয়ে বড়ো কৌতুক আর কী হতে পারে?’ বলেই সবাই অটহাসিতে ফেটে পড়ে।

মুনশী মেহেরুল্লাহ মুচকি হেসে ধীর-স্থির ভাবে এগিয়ে আসেন। প্রশ্ন করেন, ‘বাদুর দেখেছেন জনাব?’ পাদ্রী বললেন, ‘হ্যাঁ, দেখেছি।’ মুনশী এবার হাসি দিয়ে বললেন, ‘দেখেন, রাতের বেলা যখন শিকারীরা ত্রিশ থেকে চাল্লিশটা বাদুর শিকার করেন। দিনের বেলায় সেই বাদুরগুলোকে শুধু একটা মাত্র বস্তায় চেপে চেপে ভর্তি করে নিয়ে আসে। কিন্তু জনাব, ময়না দেখেছেন না? মানুষ

কিন্তু শুধু একটা ময়নার জন্যই ইয়া বিশাল খাঁচা কিনে আদর করে রাখে। এবার আপনারাই বলেন, চাল্লিশটা বাদুরের জন্যে একটা বস্তা, আর একটা ময়নার জন্যে সেই বস্তার সমান পুরোদস্ত্র একটা খাঁচা! এটা কি হাস্যকর শোনাবে?’ সবাই নীরব। মুনশী এবার বললেন, ‘ঠিক সেটাই। যার যেমন কদর, যার যেমন মূল্য।’

এখন আপনারা যারা বুক ফুলিয়ে বলেন, জাহানামে যাবো, তারা ঠিক বাদুরের মতোই! তাদেরকে জাহানামে রাখা হবে ঠাসাঠাসি করে। আর আমরা যারা জান্মাতে যাবার স্বপ্ন দেখি, আমাদেরকে ময়না পাখির মতোই আদর-যত্ন করে রাখা হবে তো, এ জন্যে অল্প মানুষের জন্যে বরাদ্দটা বেশি আর কি!

আরেকবার একজন পাদ্রী বললেন, ‘ইসলাম ধর্মে দাবী করা হয় মুহাম্মাদ-ই শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর আগমনে নাকি পূর্বের সব নবী-রাসুলের শরীয়ত রাহিত হয়ে গেছে। এটা পুরোটাই তাদের বানোয়াট কথা ছাড়া আর কিছু নয়। দেখেন, মুসলমান ভাইয়েরা, আমাদের নবী ঈসাকে আল্লাহ কিন্তু আসমানের ওপর তুলে নিয়েছেন। আর আপনাদের নবী মাটির নীচে শুয়ে আছে। এবার আপনারাই বিচার করুন, কে শ্রেষ্ঠ? আমাদেরকে মুসলমান হতে না বলে বরং আপনারাই খ্রিস্টান হওয়া যৌক্তিক।’

মুনশী দেখছেন এদের ভাষা এবং প্রশ্ন করার উচ্চে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি হচ্ছে এবং সীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা আছে। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি খুব শান্ত ভাবে বললেন, ‘জনাব! আমরা কিন্তু কুরআনের নির্দেশ মতো কোন নবী-রাসূলের মাঝে পার্থক্য করি না। তাঁরা সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি আপনি মান উঁচু-নীচুর প্রশ্নে আসেন, তাহলে একটা প্রশ্ন করতেই হয়, মুক্তা দেখেছেন? মুক্তা কিন্তু সমুদ্রের তলায় থাকে, আর উপরে যা থাকে, তা হলো জোয়ারের ফেনা!’ উপস্থিত সবাই নীরব এবং বিস্মিত!

দুই হাতে লিখেও গিয়েছেন প্রচুর।
খ্রিষ্টানদের অপপ্রচার, সমাজের
কুসংস্কার এবং অন্যায় অবিচারের
বিরুদ্ধে তিনি গদ্যে-পদ্যে বহু বই
পুস্তক রচনা করেছিলেন। তার
প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-

১. খ্রিষ্টান ধর্মের অসারতা (খ্রিষ্টীয় ধর্মের অসারতা)
২. রদ্দে খ্রিস্টান/খ্রিষ্টান
৩. দলিলগুল ইসলাম
৪. খ্রিষ্টান-মুসলমান তর্ক্যুদ্দ
৫. জওয়াবুন্নাসারা (জওয়াবে নাসারা)
৬. পন্দনামা (বাংলা)
৭. হিন্দু ধর্ম রহস্য বা দেবীলীলা
৮. বিধিবা গঞ্জনা
৯. মেহেরুল ইসলাম প্রভৃতি
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর মৃত্যুর পর ১৯০৯ সালে
তৎকালীন সরকার ‘বিধিবা গঞ্জনা’
ও ‘হিন্দু ধর্ম রহস্য’ বই দুটি
বাজেয়াপ্ত করে।

মুনশী মেহেরুল্লাহর সাহিত্যকর্মের
মধ্যে ১৮৯২ সালে খ্রিষ্টান জন
জমির উদ্দিন লিখিত ‘আসল
কুরআন কোথায়’ এর জবাবে
সুধাকর পত্রিকায় ‘খ্রিষ্টানি
ধোঁকাভঙ্গন’ শীর্ষক সুদীর্ঘ
গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৎকালীন
সময়ে বিশেষভাবে সাড়া
জাগিয়েছিল। এরপরও তিনি
‘আসল কুরআন সর্বত্র’ শীর্ষক আর
একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ সুধাকর ও
মিহির পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর খ্রিষ্টানেরা
মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর কিছু
লেখার ও বলার ভাষা যেন হারিয়ে
ফেলে। তখন স্বয়ং জন জমির
উদ্দিন মুনশী মেহেরুল্লাহ’র সাথে
এক বিতর্কে পরাজিত হয়ে
পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে
বাকি জীবন ইসলামের খেদমতে
কাটিয়ে দেন।

মুনশী মেহেরুল্লাহ জ্ঞানের জগতে
নতুন একটি প্রথা চালু করেন। যে
কেউ ইসলামকে অবমাননা করে
বিষাক্ত ভাষায় প্রশ্ন করলে তিনি
কুরআন-হাদীস খুলে উত্তর দেওয়া
শুরু করতেন না। বরং বাঁকা
প্রশ্নের জবাব বাঁকা ভাষায়
দিতেন।

যেমন-তাকে ইংরেজরা এক সভায়
ভারতবর্ষের মানুষ সম্পর্কে বলেছিলো,
'তোমাদের দেশের মানুষ বাটু, লস্বা,
খাটো, বড়, কালো, ধলো কেন? আর
আমাদের দেশে সব সাদা।'
ইংরেজদের কথার উত্তরে তিনি
বলেছিলেন, 'শুওরকা বাচ্চা এক
কিছিম হ্যায়, টাটু ক্যা বাচ্চা হ্যারেক
রকম হ্যায়!'

আরেকবার খ্রিষ্টানেরা মুসলমানদের
এই বলে বিভান্ত করছিল, তাদের নবী
ঈসা (আঃ) শ্রেষ্ঠ নবী বলে তার স্থান
চৌঠা আসমানে। বড়দের স্থান
ওপরেই হ্যায়।

মুনশী মেহেরুল্লাহ এ কথার জবাব
দিয়েছিলেন হাতেনাতে প্রমাণ
দেখিয়ে। তিনি একটা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে
এক পাশে ছোট বাটখারা এবং অন্য
পাশে বড় বাটখারা রাখলেন। পরে
দাঁড়িপাল্লা নিক্তি ধরে উঁচু করলে ছোট
বাটখারার পাশ ওপরে উঠে যায় এবং
বড় বাটখারার পাশ নিচে নেমে যায়।
তিনি বলেন, 'ছোট বড় বিচারের
জন্য এর চেয়ে আর কি চান?' এ
ঘটনার পর খ্রিষ্টানেরা ওই ধরণের
কথা আর কোনদিন বলেনি।

উপস্থিত বুদ্ধিতে আসলেই এই
মানুষটির কোন তুলনা হ্য না। জ্ঞান,
প্রজ্ঞা ও বিচার-বুদ্ধিতে এত বেশি
বিচক্ষণ, সত্যিই বিরল! অবশ্য আমি
বিশ্বাস করি, এখানে আল্লাহর
সাহায্যও তাঁকে ছায়া দিয়েছে
বারবার।

আমাদের কাছে যুক্তির্কগুলো খুব
সাধারণ মনে হলেও, তখনকার
প্রেক্ষাপটে এগুলোর যথেষ্ট
আবেদন ছিলো। তার কারণ,
বাহাসে যারা আসতো, তারা
নিছক মজা পাবার জন্যে
আসলেও তর্কের জয়-পরাজয়
তাদের অনেকেরই ধর্মচ্যুত হবার
সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করতো।
শাসকগোষ্ঠীর বৈরিতা ও রক্তচক্ষু
অনেক মুসলিম পণ্ডিত, জ্ঞানী ও
নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিকে
আপোষকামিতায় বাধ্য করেছিল।

ঠিক সেই সময়ে এগিয়ে
এসেছিলেন তেজোদীপ্ত ঈমানের
অধিকারী সাহসী পুরুষ মুনশী
মেহেরুল্লাহ। দেশের বিভিন্ন
জায়গায় নিজেই উদ্যোগ নিয়ে
সভা-সমিতির আয়োজন করে
মুসলমানদের ভগ্নহৃদয়কে
উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন
তিনি। ইতিহাস সাক্ষী, একদিকে
ব্রিটিশ রাজশক্তির রক্তচক্ষু,
অন্যদিকে খ্রিস্টান মিশনারি ও
বিদ্রোহী হিন্দু নেতৃবৃন্দের যুগপৎ
ষড়যন্ত্রের পরও মুনশী মেহেরুল্লাহ
অনেকটাই সক্ষম হয়েছিলেন
জনতার হত মনোবল ফিরিয়ে
আনতে।

খিষ্টানেরা হাটবাজারের দিন হাটে আগত মুসলমানদের জড়ে করে মিথ্যার তুবড়ি উড়িয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চাইলে তিনি ওই সভার পাশে দাঁড়িয়ে অসাধরণ তেজস্বিনী ভাষায় তার জবাব দিতেন। তিনি শুধু স্থানীয়ভাবে প্রতিবাদ করতেন না। বাংলার সর্বত্র তার উপস্থিতি ও প্রতিবাদ ছিল। পিরোজপুর জেলায় একবার খিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের তিন দিন ধরে তর্কযুদ্ধ চলে। ওই তর্কে মুনশী মেহেরুল্লাহ খিষ্টানদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

তিনি মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য ১৮৮৯ সালে যশোরে গড়ে তোলেন ‘ইসলাম ধর্মোন্ডেজিকা’ নামে একটি ইসলাম প্রচার সমিতি। বৃহত্তর আঙ্কিকে কাজ করার জন্য তিনি কলকাতায় গঠিত ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি’র সাথে যুক্ত হন। ইসলামের বিরুদ্ধে যে ধরণের ঘড়্যন্ত ও অপপ্রচার হতে মুনশী মেহেরুল্লাহ সেগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।

শুধু তাই নয়, মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে যখন কালো মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল; তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন সাহিত্য ও সমকালীন জ্ঞানচর্চায় মুসলমানদের এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা। সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মাধ্যমে এবং শিক্ষিত

জনগোষ্ঠীর মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুভূতি জাগ্রত করে মুনশী মেহেরুল্লাহ অনিবার্য জাগরণ ঠেকানোর সকল ফন্দি-ফিকিরের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিলেন।

আমাদের এখনকার ইন্টেলেকচুয়াল লড়াইয়ের গতি-প্রকৃতির সাথে তখনকার যুক্তি-তর্কগুলোর একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। সময়, চাহিদা এবং জনসাধারণের অবস্থান বিবেচনায় মিশনারি তৎপরতাও ছিলো ভিন্ন। ধর্মান্তরিতকরণের জন্যে তারা মূলত ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম রিলেটেড কিছু কমন পয়েন্টকে লজিক্যালি আক্রমণ করতো। এরা কিন্তু বেশ সফলও হয়েছিল। তার অন্যতম প্রমাণ মহাকবি শ্রী মধুসূদনের ‘মাইকেল মধুসূদন’ হওয়া। মুঙ্গী জমির উদ্দীন-ইনিও বেশ সমাদৃত ছিলেন থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে; কিন্তু তাঁকেও ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল মিশনারি গোষ্ঠী। পরে অবশ্য মুনশী মেহেরুল্লাহর প্রচেষ্টায় তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আজকে আমরা যাঁদের নিয়ে গবর্ন করি, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন, শেখ ফজলল করিম- এঁদের পৃষ্ঠপোষক এবং প্রেরণাদাতা ছিলেন মুনশী মেহেরুল্লাহ। মুসলমানদের মধ্যে বিরাজিত মতানৈক্য এবং বিরোধ নিরসন করা এবং পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির উৎর্দে ওঠে ঐক্যের পতাকাতলে সবাইকে সমবেত করতে তিনি নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন।

অসাধারণ প্রজ্ঞা ও প্রতিভার অধিকারী মুনশী ব্যক্তিগত জীবনে পেশায় একজন সামান্য দর্জি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ হয়েও নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হতে পেরেছিলেন। নিজের চেষ্টা ও আন্তরিকতায় কম্পারেটিভ রিলিজিওন বা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে এত বেশি ব্যৃৎপদ্ধি অর্জন করেছিলেন, ভাবতেই অবাক হতে হয়। উপনিবেশিক শাসনামলে খ্রিষ্টান মিশনারিগুলোর ভয়ানক দৌরাত্ম্য এবং তার বিপরীতে মুসলিম সমাজের দৈন্য অবস্থায় তিনি ব্যথিত হন এবং নিজেই উদ্যোগী হয়ে পড়াশোনা শুরু করেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে। ১৯০৬ সালে ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনে যে ক'জনের ভূমিকা স্মরণযোগ্য তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম।

মুনশী মেহেরুল্লাহর সময় বাংলার মুসলমানদের এমন দুঃসময় ছিল, খ্রিষ্টানদের মুখরোচক প্রচারণা ও স্বার্থের লোভে দলে দলে মুসলমানেরা খ্রিষ্টধর্মে ভিড়তে থাকে। এ অবস্থা থেকে মুসলমানদের ঠেকাতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়ান তিনি। সভা-সমাবেশ তো ছিলই, তার ওপর ছিল লেখনি সংগ্রাম।

যেখানেই ইসলাম ধর্মের বিরোধীতা সেখানেই মুনশী মেহেরুল্লাহর সভা-সমাবেশ আর তেজস্বী বক্তৃতা। তার অসাধারণ বাণিতা এবং অখণ্ডনীয় যুক্তির কাছে হার মানতো খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকেরা।

স্বল্প শিক্ষিত মেহেরুল্লাহ তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং প্রত্যৃৎপন্নমতির সাহায্যে তৎকালীন উচ্চ শিক্ষিত এবং সরকারি মদদপুষ্ট খ্রিষ্টান পাদ্রিদের ধর্ম প্রচারের গতিকে বিঘ্নিত করেছিলেন।

কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহর মুসলিম জাগরণে অনলবঁৰী বক্তৃতা, লেখনি ও কর্মযজ্ঞে উদ্বৃদ্ধ হয়ে বাংলার বিভিন্ন জেলায় বহু স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, মক্তব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর নিজ গ্রাম ছাতিয়ানতলার পাশে মনোহরপুরে বাংলা ১৩০৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন মাদরাসায়ে কারামতিয়া ও একটি মাইনর স্কুল। পরে সেটি রূপান্তরিত হয়ে এম ই স্কুলে। আদর্শবান চরিত্রবান সুনাগরিক গড়ে তোলাই ছিলো তাঁর লক্ষ। সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ ও ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি ছিল তাঁর কর্মময় জীবনের ব্রত। সর্বোপরি খ্রিষ্টান মিশনারীদের তৎপরতাঁর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠানটি ছিল তাঁর আদর্শের প্রতীক। তাঁর কীর্তি বহন করে চলেছে যশোর সদর উপজেলার ঝাউড়িয়া গ্রামের মুনশী মেহেরুল্লাহ অ্যাকাডেমি (মাধ্যমিক বিদ্যালয়)।

‘মুসলিম জাগরণের বিপ্লবী পথিকৃৎ’ শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার উল্লেখ করেছেন, “মেহেরুল্লাহর শাব্দিক অর্থ আল্লাহর

অনুগ্রহ। প্রকৃত অর্থেই তিনি পথহারা বাংলার মুসলমানদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ছিলেন। মাদরাসায় পড়া খেতাবধারী আলিম না হয়েও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য নানারূপ প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও অবিরাম সংগ্রাম, সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট, পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ আন্দোলন করে গেছেন।”

মুনশী মেহেরুল্লাহ ১৯০৭ সালের ৭ জুন ইন্ডিকাল করলে কিছু দিন তার নাম যেন হারিয়ে ছিল। প্রায় ছয় দশক একান্ত অবহেলা উপেক্ষায় থেকে ১৯৬৬ সালে মুনশী মেহেরুল্লাহর নাম স্বমহিমায় উঠে আসে জনারণ্যে। বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি জসিমউদ্দিন, কবি কাদের নওয়াজ, ড. গোলাম সাকলায়েন, সুন্দরবনের ইতিহাস লেখক এএফএম আবদুল জলিল, কবি নাসিরউদ্দিন আহমদ, ড. নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুমসহ খ্যাতিমান কবি সাহিত্যিক গবেষকেরা। এ ছাড়া মন্ত্রী, এমপি এবং উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময়ে মেহেরুল্লাহর জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেছেন।

মুনশী মেহেরুল্লাহ জীবনকে উদয় থেকে অন্ত পর্যন্ত এক দিনের সূর্যের মতো মনে করতেন। আর কাঞ্চিত লক্ষ্যে পৌছানোর পথকে দীর্ঘ ভাবতেন। তাই তো তিনি

বলতেন, ‘ভাব মন দমে দম/রাহা দূর বেলা কম।’ মুনশী মেহেরুল্লাহ সময় পেয়েছিলেন খুব কম। মাত্র ৪৬ বছর বয়সে ১৯০৭ সালের এক জুমাবার তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ তাঁকে জানাতের পাখি হিসেবে করুল করুন।

মুনশী মেহেরুল্লাহ বাংলাদেশের মুসলমানদের হৃদয় আসনে প্রতিষ্ঠিত একটি নাম। বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর স্মৃতি ধরে রাখতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন তাঁর ভক্ত-অনুরক্তরা। তাঁর নামে ডাক বিভাগ স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে যশোর সদর উপজেলার চুড়ামনকাটি রেলস্টেশনকে মেহেরুল্লাহ নগর রেল স্টেশন নামকরণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও রেল ভ্রমণকারীদের কাছে তাঁর নামের পরিচিতি প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। যশোর টাউনহল ময়দান আজ মেহেরুল্লাহ ময়দান নামে পরিচিত। যশোর শহর এবং তাঁর নিজ এলাকার একাধিক সড়কের নামের সাথে কর্মবীরের নাম জড়িয়ে স্মৃতি অল্পান করা হয়েছে।

কালান্তরের কড়চায় মুনশী মেহেরুল্লাহ বিস্মৃত ঠিকই, কিন্তু অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে শুন্দা ও ভালোবাসায় তিনি ভাস্তর থাকবেন ইতিহাস-সচেতন বাঙালী মুসলমানের মানসপটে।

তথ্যসূত্র:

1. শতাব্দীর দর্পন, ফজলুর রহমান, পৃষ্ঠা ৫২,
প্রকাশ ১৯৯৫।
2. Hussain, Mohsin | “Meherullah,
Munshi Mohammad”।
3. Banglapedia | Asiatic Society of
Bangladesh | সংগৃহীত ২ জানুয়ারি ২০১৫।
4. মুসলিম বাংলার মনীষা।

জানাতে খেজুর বাগান কেনার গাছ!

সংকলক - আব্দুস সালাম

মদিনার বাগানগুলোর মধ্যে এক ইয়াতীম ছেলের একটি বাগান ছিল। তার বাগানের সাথে লাগোয়া বাগানের মালিক ছিলেন আবু লুবাবা নামের এক লোক। সেই ইয়াতীম ছেলেটি নিজের বাগান বরাবর একটি প্রাচীর দিতে গিয়ে দেখলো, প্রতিবেশীর একটি খেজুর গাছ সীমানার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। ছেলেটি তার প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে সমস্যার কথা বলে সীমানার খেজুর গাছটি কিনতে চাইলো যাতে প্রাচীরটি সোজা হয়। কিন্তু প্রতিবেশী আবু লুবাবা কোনভাবেই বিক্রি করতে রাজি হচ্ছিলেন না।

কোন উপায় না পেয়ে সেই ইয়াতীম রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা বুঝিয়ে বললো। আল্লাহর রাসুল (ﷺ) ডেকে পাঠালেন আবু লুবাবাকে। সে মসজিদে নববীতে আসলে নবী করীম (ﷺ) সেই খেজুর গাছটি

অর্থের বিনিময়ে হলেও ইয়াতীম ছেলেটিকে দিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। আবু লুবাবা যথারীতি রাজি হলো না।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এক পর্যায়ে তাকে বললেন, “তোমার ভাইকে ওই খেজুর গাছটি দিয়ে দাও। আমি তোমার জন্য জানাতে একটি খেজুর গাছের জিম্মাদার হব।” বিস্ময়কর হলেও আবু লুবাবা তারপরেও সেই খেজুর গাছ দিতে রাজি হলেন না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এই পর্যায়ে চুপ হয়ে গেলেন। এর চেয়ে বেশী তিনি (ﷺ) আর কী বলতে পারেন!

উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে সাবিত (রাঃ) ও ছিলেন। তিনি ‘আবু দাহদাহ’ নামে পরিচিত ছিলেন। মদিনায় তাঁর খুব সুন্দর একটি বাগান ছিল। প্রায় ৬০০ খেজুর গাছ ছাড়াও একটি মনোরম বাড়ি ও একটি পানির কুয়া ছিল সেখানে। মদিনার সব বড় ব্যবসায়ীদের

কাছে আবু দাহদাহ (রাঃ) এর বাগানটি সুপরিচিত ছিল। তিনি স্বপরিবারে সেখানে বসবাস করতেন। আবু দাহদাহ (রাঃ) হঠাৎ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে গিয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমি যদি আবু লুবাবার কাছ থেকে এই খেজুর গাছটি কিনে এই ইয়াতীমকে দিয়ে দেই, তাহলে আমিও কি জানাতে একটি খেজুর গাছের মালিক হবো?’ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘হ্যাঁ, তোমার জন্যও জানাতে খেজুর গাছ থাকবে।’

আবু দাহদাহ (রাঃ) সাথে সাথে আবু লুবাবাকে বললেন, ‘আপনি আমার সেই সম্পূর্ণ বাগানটি গ্রহণ করে সেই খেজুর গাছটি আমাকে দিয়ে দিন’। আবু লুবাবা ‘দুনিয়াবী’ এই বিনিময় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, বেহ্শ হয়ে গেলেন। হঁশ ফিরলেই তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ আমি আপনার খেজুর গাছের

ବାଗାନଟି ଗ୍ରହଣ କରଲାମ । ବିନିମୟେ
ଆମାର ସେଇ ଖେଜୁର ଗାଛଟି ଆପନାକେ
ଦିଯେ ଦିଲାମ ।”

ଆବୁ ଦାହଦାହ (ରାଃ) ସେଇ ମୁହଁତେହେ
ଖେଜୁର ଗାଛଟି ଇଯାତୀମ ଛେଳେଟିକେ
ଉପହାର ହିସେବେ ଦିଯେ ଦିଲେନ ।
ତାରପର ରାସୁଲୁନ୍ନାହ (୧୩୫) ଏର ଦିକେ
ତାକିଯେ ବଲଲେନ, ‘ହେ ରାସୁଲୁନ୍ନାହ!
ଏଥନ ଆମି କି ଜାଗାତେ ଏକଟି
ଖେଜୁର ଗାଛେର ମାଲିକ ହଲାମ?’
ରାସୁଲୁନ୍ନାହ (୧୩୫) ବଲଲେନ, “ଆବୁ
ଦାହଦାହ’ର ଜନ୍ୟ ଜାଗାତେ ଏଥନ କତ

ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଖେଜୁରେର ବାଗାନ
ଅପେକ୍ଷା କରଛେ ।”
ବର୍ଣନାକାରୀ ଆନାସ (ରାଃ) ବଲେନ, ଏ
କଥାଟି ରାସୁଲୁନ୍ନାହ (୧୩୫) ଏକ, ଦୁଇ ବା
ତିନିବାର ବଲେନନି; ବରଂ ଖୁଶି ହେୟ
ବାରବାର ବଲେଛେନ ।

ଶେଷେ ଆବୁ ଦାହଦାହ (ରାଃ) ସେଖାନ
ଥେକେ ବେର ହେୟ ସଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରେ
ଦେୱୋ ସେଇ ବାଗାନେ ଫିରେ ଗେଲେନ ।
ବାଡ଼ିର ଦରଜାଯ ଏସେ ସ୍ତ୍ରୀକେ ଡାକ
ଦିଲେନ ତିନି, ‘ହେ ଉମ୍ମେ ଦାହଦାହ!
ବାଚାଦେରକେ ନିଯେ ଏ ବାଗାନ ଥେକେ

ବେର ହେୟ ଆସୋ । ଆମି ଦୁନିଆର ଏହି
ବାଗାନ ବିକ୍ରି କରେ ଦିଯେଛି ।’ ତାଁର ସ୍ତ୍ରୀ
ବଲଲେନ, ‘ଆପନି କାର କାହେ ଏଟି
ବିକ୍ରି କରେଛେନ? କେ କତ ଦାମ ଦିଯେ
ଏଟି କିନେ ନିଯେଛେ? ଆବୁ ଦାହଦାହ
(ରାଃ) ବଲଲେନ, “ଆମି ଜାଗାତେ
ଏକଟି ଖେଜୁର ବାଗାନେର ବିନିମୟେ ତା
ବିକ୍ରି କରେ ଦିଯେଛି ।” ତାଁର ସ୍ତ୍ରୀ
ବଲଲେନ, “ଆନ୍ତାଙ୍କୁ ଆକବାର! ହେ ଆବୁ
ଦାହଦାହ! ଆପନି ଅବଶ୍ୟଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଲାଭଜନକ ଏକଟି ବ୍ୟବସା କରେଛେନ ।”
[୧]

[୧]: ମୁମଳାଦେ ଆହମାଦ, ହାଦୀମ ୧୨୫୦୪;
ଇବନେ ଘୀବୋନ, ହାଦୀମ ୧୧୫୯;
ମୁଖାଦରାକେ ଥକୀମ, ହାଦୀମ ୨୧୯୪

অমীম ঘণ্টাৰ

প্ৰথম মোপানেৰ সাথে পৱিচয়

কোমঠেনগাথাৰ মীম

হঠাতে চোখ খুলতেই দেখি
শুয়ে আছি অঙ্ককাৰ একটা
ঘৰে। চোখ খুলেই কেমন
যেন বদ্ধ লাগছে নিজেকে।
এখন আমি কোথায়? আৱ
নড়তেই বা পাৱছি না
কেন? হাতটা একটু পাশে
সৱাতেই বালি বালি লাগছে
।।আৱেহ, এ তো মাটিৰ
চূড়াছড়ি। আছছা, আমি কি
তৰে সেই সুনিশ্চিত
গন্তব্যেৰ প্ৰথম ধাপে আছি?
সাড়ে তিন হাত মাটিৰ
নিচে আমাকে একা রেখে
গেল এভাৱে সবাই? সবাই
না হয় এমন কৱতে পাৱে,
আমাকে ভালোবাসে না।
কিন্তু আৰু! সেও আমাকে
একা রেখে গেল এখানে?
আৰু তো আমাকে খুব
ভালোবাসতো।

এইতো কিছুক্ষণ আগেই
আমি দুনিয়ায় ছিলাম আৱ
এখন কৰৱে, হয়
আফসোস! এটা কি আমাৰ
স্বপ্ন? আমি কি ঘুমেৰ
ঘোৱে আছি? না না,
এখনো তো কৰৱেৰ
বাহিৱে লোকজনেৰ শব্দ
শুনতে পাচ্ছি। আমাকে
মাটি দেওয়াৰ কথা বলছে
ওৱা।

কি নিষ্ঠুৱ দুনিয়াৰ
মানুষজন! আমাকে জানাযা,
গোসলেৰ মাধ্যমে বিদায়
দিয়ে এতদিনেৰ এত গভীৰ
মায়ায় বেঁধে আজ শেষে
কিনা মাটিতেই আমাকে
একা রেখে যাচ্ছে?
এইখানে হাজাৱো
পোকামাকড়েৱ আনাগোনা।
সেইবাৰ বন্যাৰ দিনে

সাপ-বিছুৱ ভয়ে সে কি
চিৎকাৱ আমাৰ! আৰু,
তুমি এভাৱে আমাকে রেখে
গেলে এই অঙ্ককাৰ ঘৰে!
আমাৰ যে খুব ভয় লাগে
এই বিষধৰ সাপে! আৰু,
যেওনা গো আমাকে রেখে।

অনুভব কৱছি, আমাকে
মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে
সবাই। আমাৰ পৃথিবীৰ
আলো দেখা বন্ধ হয়ে গেছে
প্ৰায়। খুব ভয় লাগছে
আমাৰ। এত অঙ্ককাৰে
আমাৰ খুব কষ্ট হচ্ছে।
দুনিয়াৰ জীবনে আৰু তো
বিদ্যুৎ গেলেই সাথে সাথে
বাতিটা জ্বালিয়ে দিতেন।
এখানে তো আৰুও নেই।
আমুকেও ভয়ে জড়িয়ে
ধৰতে পাৱছি না। বাতি টা
জ্বালাবে কেই শুনো, কেউ

কি নেই তোমরা? একটু
আলোর ব্যবস্থা করে দাওনা
কবরটাতে, আমি যে ভয়
পাচ্ছি অঙ্ককারে। একটু
শ্লেষ্ণা আমাকে।

এখানে আমি বড় একা।
পোকামাকড়গুলো নিজের
চাহিদা পূরণে আমাকে
ঘিরে রয়েছে। আমার চোখ
চাতকের মতন আলো
খুঁজছে। আমি কান খাঁড়া
করে শব্দ শুনে নিজেকে
সাঞ্চনা দিচ্ছি, ‘আমার
আশেপাশে হাজারো মানুষ।
আমি একদমই একা নই।’
কিন্তু সবাই আমার কবরে
মাটি দিয়ে আস্তে আস্তে
চলে যাচ্ছে আর
বলছে—‘ইমালিল্লাহ।’
প্রিয়জনরাও চলে যাচ্ছে
সবাই। আমার সবচেয়ে
প্রিয় ব্যক্তিটা আমার জন্য
ঘন্টাখানেক কাঁদতে রাইলো
। অবশ্যে তাকেও নিয়ে
গেলো অন্যরা। আমি
চিঢ়কার করে যেন বলতে
চাইলাম, ‘যেওনা গো।
আমি অঙ্ককার বড় ভয়
পাই। আমি একা থাকতে
পারিনা। আবু, আলোটা
জ্বালিয়ে দিয়ে যাও।
তোমার মেয়েকে কত

ভালোবাসা দিয়ে আগলে
রেখেছিলে। আজ মাটিতে
একা রেখে যাবে?’

ডাকতে ডাকতে কষ্ট থেকে
আর আওয়াজ বের হচ্ছেনা
। চোখটা ঝাপসা হয়ে
যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে আমি
বাসায় কান্না করলে, আমার
ছোটবোনটা জড়িয়ে ধরে
আর আমাকে হাসিয়ে মনটা
ভালো করে দেয়। আজকে
পিচিটা নেই পাশে। খুব
মিস করছি রে তোকে। বহু
ব্যবধান এখন আমাদের
মাঝে...

অনেকক্ষণ কেটে গেলো।
সময়ের হিসেব তো কবরে
করতে পারছি না। দুনিয়ার
জীবনেই ঘড়ির সময় না
দেখতে পেলে, সময়ের
অনুমানে বড় ভুল করতাম
আমি। কতক্ষণ পার হলো
বুঝতে পারছিনা। ভয়ে
ভয়ে দুনিয়ায় ফিরে
যাওয়ার আরেকটা ইচ্ছে
জাগছে মনে। ক্রমশই মনে
হচ্ছে পোকামাকড়গুলো
আরেকটু কাছে চলে
এসেছে আমার। আরেকটু
বেশি ইবাদাত করতে মন
চাইছে এসব দেখে।

ভুলগুলো শুধৱে নেওয়ার
আর সুযোগ পাবো না সেটা
ভেবে খুব আফসোস হচ্ছে
আজ।

চোখ মোছার সময় না
পেয়েই অনুভব করলাম,
আমার কবর যেন ক্রমশই
ছেট হয়ে আসছে। আড়
চোখে একটু ডানদিকে
তাকাতেই মাটি আমাকে
এমন চাপ দিলো যে,
আমার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে
গিয়েছে। আমি হাঁপিয়ে
গেলাম। মাটি যেন আমায়
বলছে, ‘তোমার প্রতিপত্তি
আজ শেষ। এবার আমার
রূপ দেখো। খুব
দান্তিকতার সাথে তো
দুনিয়ায় হেঁটেছো। আমার
যে কষ্ট হয় তা একেবারেই
তোয়াক্তা করতে না।’

কিছু মুহূর্ত পার হতে না
হতেই দু'জন ভয়ংকর
চেহারার লোক আমার
সামনে হাজির হলো। রাগী
কঢ়ে আমায় জিজ্ঞেস
করলো, ‘তুমি কি প্রস্তুত
প্রশ্নের উত্তর দিতে?’

এরাই বুঝি সেই মুনকার
নাকীর, যাদের সম্পর্কে

আমি বইতে পড়েছিলাম।
আমায় তিনটে প্রশ্ন করলো
তারা। কতবার মুখস্থ
করেছিলাম প্রশ্নের
উত্তরগুলো। কারণ,
পরীক্ষায় একটা ক্ষমন প্রশ্ন
থাকতো এটা নিয়ে।
জিজ্ঞেস করলো, ‘তোমার
রব কে?’ আমার যেন
কিছুতেই মনে আসতে
চাইছে না এর উত্তর। অথচ
আমি তো বহুবার পড়েছি
এই প্রশ্নের উত্তর।
অবশ্যে একের পর এক
প্রশ্নের উত্তর দিলাম, তবে
বলতে একটু সময় লাগলো

।
মুনকার নাকীর আমাকে
বললো, ‘দুনিয়ায় যারা
সেদিন আল্লাহকে মনে

করেনি, আল্লাহ আজ
তাদের মনে করবেন না।
ভুলিয়ে দেবেন উত্তরগুলো,
দুনিয়াতে হাজারবার পড়ার
পরেও।’ আল্লাহ তাদেরকে
বলবেন, ‘দুনিয়ায় তুমি
আমায় মনে করোনি, আজ
আমিও তোমার সাথে
সেরূপ ব্যবহার করব।’

মৃত্যুতে ছেয়ে গেছে বিশ।
একটা বারও কী মনে হ্যনা,
আজ এক্ষুনি নিজেকে
শুধরানো দরকার! আমরা
যারা বিশ্বাস করি মৃত্যু
আছে, ঘটবেই। আমরা
কখনো ভেবেছি সেই
মুহূর্তটার কথা যখন মনে
হবে, এইতো কিছুক্ষণ
আগেই আমি দুনিয়ায় ছিলাম
আর এখন কবরে! হায়

আফসোস! আমি আমার
রবের সামনে কি নিয়ে
দাঢ়াবো! মনে কখনো
উদ্বিঘ্নতা আসেনা আমাদের
মৃত্যুভয় নিয়ে?

কুরআন আল্লাহ মুবহাম্মান
ওয়া ফাতেলা বলন-
‘প্রতিটি জীবন মৃত্যুর স্বাদ
গ্রহণ করবে এবং
বিয়াগ্নির দিন
গ্রেমাদ্যুক্ত পূর্ণমাস্ত্রায়
বিনিয়য় দেয়া হবে। যে
ব্যক্তিকে জাহানামের আশ্রম
হত্তে রক্ষা করা হল এবং
জাহানে দাখিল করা হল,
অবশ্যুৎস ব্যক্তি
সকলকাম হল, কেননা
পার্থিব জীবন চলমান বস্তু
ছাড়া আর কিছুই নয়।’[১]

[১] সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৮৫

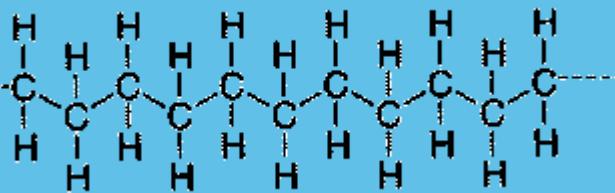
প্লাস্টিকের রাজত্ব!

-মাহফুজ আনাম দিপু

দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিকের পণ্য ব্যবহার করেন না এমন মানুষ খোঁজা বৃথা। আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে প্লাস্টিকের পণ্য। প্লাস্টিক যে পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর তা জানা সত্ত্বেও দামে সন্তা এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য হওয়ায় অধিকাংশ মানুষই ঝুঁকছে প্লাস্টিকের দিকে। বর্তমানে সারা বিশ্বেই প্লাস্টিকের দূষণ দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারন করছে। শুধু অনুন্নত দেশগুলোই নয়, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোও এই দূষণের জন্য দায়ী। সময়ের সাথে সাথে ক্ষতিকর প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার একরকম বেড়েই চলেছে।

বেসরকারি একটি সংস্থা ‘এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন’ বাংলাদেশের প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার নিয়ে একটি জরিপ চালায়। তাদের গবেষণায় দেখা গেছে, তরুণ এবং যুবকরাই পরিবেশে প্লাস্টিক দূষণের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। যেসব খাবারের সঙ্গে প্লাস্টিকের প্যাকেট রয়েছে, সেগুলোই সবচেয়ে বেশি ভোগ করছে তরুণ এবং যুবকেরা যাদের বয়স ১৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে।





কিন্তু এই প্লাস্টিক কেন এতো ক্ষতিকর? প্লাস্টিকের রাসায়নিক গঠনের মধ্যে যদি একটু উঁকি দিই তাহলে দেখতে পাবো, এটি আসলে একধরনের কৃত্রিম পলিমার। গঠন ও তাপীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কৃত্রিম পলিমার (প্লাস্টিক) দুই ধরনের। এর মধ্যে এক ধরনের পলিমার লম্বা সরু জট পাকানো শিকল গঠন করে। এ ধরনের পলিমার শিকলের কার্বনসমূহের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধন গঠিত হয়। কিন্তু পার্শ্ববর্তী শিকলসমূহের মধ্যে দুর্বল আকর্ষণ বল কাজ করে। এই শিকলগুলো একটি অপরাদির ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে। ফলে এ জাতীয় পলিমারকে সহজে সম্প্রসারিত, বাঁকানো এবং তাপ প্রয়োগে গলানো যায়। এ ধরনের পলিমারকে থার্মোপ্লাস্টিক বলে। যেমন পলিথিন, পলিপ্রোপিলিন, PVC ইত্যাদি।

থার্মোপ্লাস্টিককে বার বার গলানো যায় এবং বিভিন্ন আকৃতির বস্তুতে পরিণত করা যায়। দ্বিতীয় ধরনের পলিমারে কার্বন পরমাণুসমূহ শিকলের মধ্যে সমযোজী এবং একই সাথে পার্শ্ববর্তী শিকলের কার্বনের সাথে দৃঢ়ভাবে হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। এ ধরনের পলিমারকে থার্মোসেটিং প্লাস্টিক বলে। থার্মোসেটিং প্লাস্টিক, থার্মোপ্লাস্টিকের চেয়ে শক্ত এবং কম নমনীয়। তাপ প্রয়োগে এগুলো গলার পরিবর্তে কয়লায় পরিণত হয়। এ অবস্থায় কার্বন শিকলের ক্রস লিংক ভেঙে গেলে পলিমার বিয়োজিত হয়। থার্মোসেটিং প্লাস্টিককে একবার মাত্র গলানো এবং আকার দেওয়া যায়। সচরাচর কম্প্রেশন মোন্ডিং এর মাধ্যমে এটা করা হয়। যেমন ব্যাকেলাইট, ফাইবার গ্যাস, কৃত্রিম রেজিন এবং ইপোক্রি গ্লি। কৃত্রিম পলিমার বা প্লাস্টিক ব্যবহারের প্রধান সমস্যা হলো, এটি বিয়োজিত হয় না এবং পরিবেশকে দূষিত করে। অধিকাংশ প্রাকৃতিক উপাদান মাটির ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয় কিন্তু প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয় না। এ জন্য প্লাস্টিককে নন বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ বলে। অনেক ক্ষেত্রে প্লাস্টিককে পুড়িয়ে শেষ করা হয় যাতে বিষাক্ত ধোঁয়া (হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, অ্যালডিহাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড) উৎপন্ন হয়। এ সকল গ্যাস মানুষের শরীরে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

গোটা পৃথিবীর ২৭.৮% প্লাস্টিক তৈরী করে চীন। এবং এই তালিকায় শ্রমাগত আছে ইউরোপের দেশগুলো।





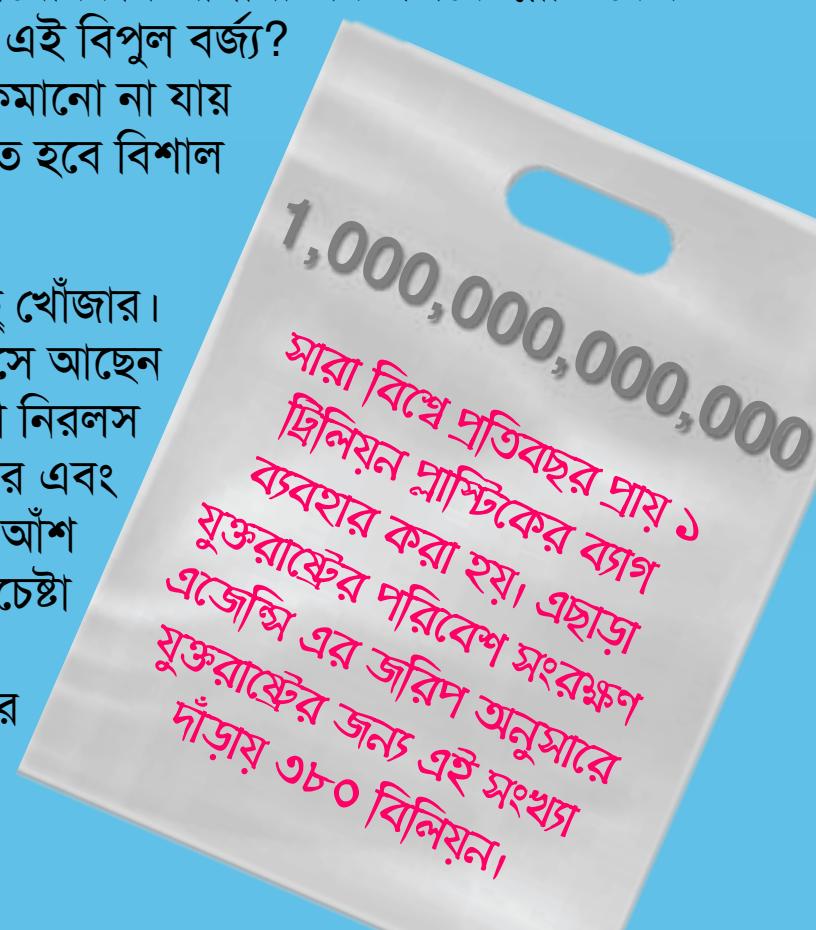
এইতো কিছুদিন আগের কথা। অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে এক মরা তিমি ভেসে উঠেছিল। তার পেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল অনেক প্লাস্টিকের কণ। এরূপ অবস্থা জলজ সব প্রাণীকুলেরই, এমনকি মানুষেরও। তবুও প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে না। ‘দ্য গ্লোবাল অ্যালাইন্স ফর ইনসাইনারেট’র অল্টারনেটিভস (জিএআইএ)’ এর মতে, বিশ্বব্যাপী সমুদ্রে প্রতি বছর প্রায় ৮০ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য পতিত হয়। অপরদিকে, জাতিসংঘের মতে, ‘প্লাস্টিক বর্জ্য এখন মহামারীর রূপ নিয়েছে। মহাসাগরে অন্তত ১০ কোটি টন প্লাস্টিক পাওয়া যায়। যার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই ভূমি উৎস থেকেই পতিত হয়।’

প্লাস্টিকের এই রাজতৃ থেকে হিমালয় পর্বতও রক্ষা পাচ্ছে না। নেপাল সরকার পৃথিবীর সর্বোচ্চ এই পর্বতের আশেপাশে থেকে সে বর্জ্য সরানোর চেষ্টা করে চলেছে। তাদের অভিযানে এখন পর্যন্ত পাঁচ টন বর্জ্য উদ্ধার হয়েছে।

একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, যেভাবে দূষণ বাড়ছে তাতে ২০৫০ সালে সমুদ্রে মাছের তুলনায় প্লাস্টিকের সংখ্যা বেশি হবে। এর মোকাবেলা কীভাবে হবে, তা নিয়ে নিদিষ্ট রূপরেখা নেই। এর মধ্যেই খবর মিলেছে, আমেরিকায় আগামী এক দশকে প্লাস্টিকের উৎপাদন বাড়বে ৪০ শতাংশ। কোথায় যাবে এই বিপুল বর্জ্য? সুতরাং, খুব শীত্রেই যদি প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো না যায় তাহলে কয়েক দশকের মধ্যেই পৃথিবী পরিণত হবে বিশাল এক প্লাস্টিকের আস্তাকুঁড়ে।

এখনই সময় এসেছে প্লাস্টিকের বিকল্প কিছু খোঁজার। এ নিয়ে যে বিজ্ঞানীরা একেবারেই চুপচাপ বসে আছেন তা কিন্তু নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞানীরা নিরলস প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন প্লাস্টিকের দূষণ কমাবার এবং এর বিকল্প খোঁজার। বাংলাদেশেও সোনালী আঁশ পাঠ থেকে প্লাস্টিকের বিকল্প পণ্য তৈরীর প্রচেষ্টা চলছে এবং অনেকাংশে সফলতাও অর্জিত হয়েছে। এছাড়া গাছের সেলুলোজ এবং আলুর খোসা থেকেও ফাইবার তৈরীর চেষ্টা চলছে।

ড্রিমলাইনার ৭৮৭ বোয়িং বিমান নির্মাণ করা হয় কার্বন ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক দিয়ে এর ফলে অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় এ ধরনের বিমানগুলোর ২০% ওজন হ্রাস পাচ্ছে অচিরেই।





ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) : কামড় ব্যবসায়ী থেকে যুগশ্রেষ্ঠ আলিম!

- শাহমুন নাকীব ফারাবী

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), বিশ্বজোড়া এক প্রসিদ্ধ নাম। তাঁর প্রকৃত নাম নুমান, উপনাম আবু হানিফা। পিতার নাম সাবিত। পুরো নাম নুমান ইবনু সাবিত ইবনু যুতি আল-মারযুবান।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর বাবা সাবিত ছিলেন একজন কাপড় ব্যবসায়ী। তিনি কিশোর বয়স থেকেই বাবাকে ব্যবসায় সাহায্য করতেন। যখন তাঁর বয়স ১৬ বছর, তখন তাঁর বাবা ইন্তেকাল করেন। বাবা ইন্তেকাল করার পর কাপড় ব্যবসার পুরো দায়িত্ব ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর কাঁধে চলে আসে। এরপর খুব অল্প সময়ের মাঝেই তিনি ব্যবসায় বেশ ভালো করেন।

একদিন তিনি বাজার দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন বয়োবৃন্দ তাঁর পথ আটকে দাঁড়ালেন। সেই বৃন্দ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বৎস, তোমার পরিচয় কী? তোমাকে প্রায়শ এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে দেখি, তুমি কী করো?’

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সেই বৃন্দের প্রশ্নের জবাবে বললেন, আমি একজন কাপড় ব্যবসায়ী। ব্যবসা করি আর এর ফাঁকে-ফাঁকে কিছু ইলম চর্চা করি।’

তখন সেই বৃন্দ বললেন, ‘এটা তো জ্ঞান অর্জনের বয়স। তুমি কি কোনো আলিমের জ্ঞানের মজলিসে বসো না?’ ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বললেন, ‘ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তেমন কোথাও বসতে পারিনা।’ তখন সেই বৃন্দ বললেন, ‘জ্ঞান অর্জনে মনোযোগী হও। আলিমদের মজলিসে যাতায়াত করো। তোমার চেহারায় আমি প্রতিভার স্ফুরণ দেখতে পাচ্ছি।’

ইমাম আবু হানিফাকে জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহ যোগানো
সেই বৃন্দ ছিলেন বিখ্যাত আলিম ইমাম শাবি (রহঃ)।
ইমাম শাবি (রহঃ) এর পরামর্শে ইমাম আবু হানিফা
(রহঃ) দারূণ প্রভাবিত হন। এরপর থেকে তিনি ব্যবসার
উদ্দেশ্যে বাজারে যাতায়াত করিয়ে দিলেন এবং ইলম
চর্চায় মনযোগী হলেন। তিনি ইলম চর্চায় এতবেশি
মনযোগী ছিলেন যে, মাত্র ২০ বছর বয়সে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে
অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

একবার ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এবং তাঁর উস্তাদ
ইমাম আ'মাশ (রহঃ) একটি মজলিসে বসেছিলেন। এমন
সময় সেখানে একজন ব্যক্তি আগমন করেন এবং ফিক্হ
বিষয়ে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। তখন ইমাম আ'মাশ
(রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-কে পরীক্ষা করার জন্য
বলেন, ‘উত্তরাটা তুমি দাও দেখি।’ তিনি সেই প্রশ্নের
যথোপযুক্ত জবাব দিয়ে দিলেন। তখন ইমাম আ'মাশ
(রহঃ) ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই
প্রশ্নের উত্তর তুমি জানলে কীভাবে?’

তখন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বললেন, ‘আপনার কাছ
থেকেই পেয়েছি।’ এরপর তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমাম
আ'মাশ (রহঃ) বর্ণিত বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন।
এতে ইমাম আ'মাশ (রহঃ) অভিভূত হয়ে বললেন, ‘আমি
গত এক বছরে যা বর্ণনা করেছি, তুমি তো এক মুহূর্তেই
সব বলে দিলে। আসলে তোমরা ফকীহরা হলে ডাঙার,
আর আমরা হলাম ফার্মাসিস্ট।’

এরপর একদিন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) নিজের মজলিসে
বসা অবস্থায় ছিলেন, এমন সময় একজন মহিলা এসে
তালাকের বিধান জানতে চাইলেন। পাশেই ছিল ইমাম হাম্মাদ
(রহঃ) এর মজলিস। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন, ‘আপনি
ইমাম হাম্মাদের কাছে এই প্রশ্ন করুন। তারপর তিনি কী উত্তর
দেয়, আমাকেও জানাবেন।’

তারপর সেই মহিলা ইমাম হাম্মাদ (রহঃ) এর মজলিসে গমন
করেন এবং উত্তর নিয়ে ফিরে আসেন। সেই মহিলার মুখে
ইমাম হাম্মাদ (রহঃ) বর্ণিত ফতোয়া শুনে তিনি বলেন, ‘ধর্মতত্ত্ব
বাদ দিয়ে এবার আমাকে ফিরছের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।’

এরপর থেকে তিনি ইমাম হাম্মাদ (রহঃ) এর মজলিসে
নিয়মিত ছাত্র হয়ে যান। তিনি ইমাম হাম্মাদ (রহঃ) এর
মজলিসে যখন ছাত্র হিসেবে ইলমচর্চা শুরু করেন তখন তাঁর
বয়স ছিল বাইশ বছর। ইমাম হাম্মাদ (রহঃ) ছিলেন কুফার
মাসজিদের ইমাম। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর বয়স যখন
চল্লিশ বছর, তখন ইমাম হাম্মাদ (রহঃ) মৃত্যুবরণ করেন।
ইমাম হাম্মাদ (রহঃ) এর মৃত্যুর পর কুফার মাসজিদের প্রধান
ইমাম হন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)।

এভাবেই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) নিছক একজন কাপড়
ব্যবসায়ী থেকে যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে পরিণত হন।

তথ্যসূত্রঃ
ইমাম আবু হানিফা : জীবন ও কর্ম

ফেসবুক ডট ডেথ

এম. এম. ম্রেণ্টামিম বিল্লাহ যায়েদ

সজাগ হয়ে প্রতিদিনের অভ্যাসমতো ঘুম-ঘুম চোখেই বালিশের পাশ থেকে মোবাইলটা হাতড়ে বের করলো সে। কিন্তু এ কী! কালো কালারের মোবাইলটা এমন কালো হলো কী করে?

ধীরে ধীরে সে বুবাতে পারলো, তার আজকের ঘুমটা অন্যদিনের মতো না। ভালোমতো চোখ খুলেই নিশ্চিত হলো যে, সে আর এ দুনিয়ায় নেই। ইতোমধ্যে তার মৃত্যু হয়ে গেছে। এখন তার প্রথম কাজ ‘ফেসবুকে’ একটা স্ট্যাটাস দেয়া। দুনিয়ার জীবনে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে একটা স্ট্যাটাস পোস্ট করার নিয়ম ভাঙ্গতে চাইলো না সে। দেখলো, মোবাইলের স্ক্রিনজুড়ে পুরোটাই ব্ল্যাক থিম, এমনকি ফেসবুক আইকনটাও। প্রেস কুরামাত্র নিউজফিড রিফ্রেশ হতে হতে কালো স্ক্রিনে একটা লোগো ভেসে উঠলো। ইংরেজিতে লেখা-ফেসবুক ডট ডেথ।

এবারে তার আসল কাজ। দ্রুতগতিতে টাইপ করে ফেললো—‘এত তাড়াতাড়ি মরে যাবো ভাবি নাই।’

পোস্ট করার পর তার মনে পড়তে শুরু করলো নিজের জীবনের কথা। ক'টা দিনই বা দুনিয়ার বুকে ছিলো সে! জাঁকজমকের সাথে উনিশতম জন্মদিনটা পালন করলো একটা সপ্তাহও হয়নি। কাল রাতেও তার কত প্ল্যান ছিলো! আজ ছুটির দিন, ইচ্ছে ছিলো সকালে একটু বেশি ঘুমিয়ে নেবে; বিকেলে লং ড্রাইভে যাওয়ার প্ল্যান বন্ধুদের সাথে, তখন ঘুমের চাহিদা থেকে গেলে সমস্যা। মনে পড়ে গেলো বাবা-মায়ের স্বপ্নের কথা। পরিবারের বড় সন্তান সে, পড়াশোনায়ও ভালো। মনে পড়তে লাগলো, প্রেয়সীর কোলে মাথা রেখে সে ভেসে যেতো স্বপ্নে সাজানো সংসার, বাচ্চা-কাচ্চা, নাতি-নাতনি..! যার সবই আজ স্মৃতি। চেয়েছিলো, একটু বড় হয়ে ধর্মকর্মে মন দেবে। হঠাত মৃত্যু এসে এলোমেলো করে দিল সব, একেবারে সব।

এসব ভাবতে ভাবতে স্ক্রিন স্ক্রিন করছিলো সে। সম্বিত ফিরে পেতেই খেয়াল করলো, যত পোস্ট দেখা যাচ্ছে, সব জায়গায় একই কথা লেখা—‘এখনই মরে যাবো, ভাবিনি

।’ চোখ কচলে কয়েকবার উপর-নিচ স্ক্রিন করে দেখলো সে। নাহ, সব জায়গায় একই টাইপের কথাই লেখা। আরো দেখলো, নিউজফিডের সমস্ত পোস্টই মৃত আইডি থেকে করা।

হঠাত মনে পড়লো, গত বছর রোড এক্সিডেন্টে মারা যাওয়া বাল্যবন্ধুর কথা। সার্চ দিয়ে তার আইডিতে ঢুকে দেখলো এক বছর তিন মাস আগের পোস্ট, ‘এখনই মারা যাবো, বুবাতে পারিনি।’

মনে পড়লো, দুই মাস আগে ক্যান্সারে মারা যাওয়া এলাকার ছোট বোনটির কথাও। চৌদ্দ বছরের মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য সে নিজেও স্ট্রিট কালেকশন করেছিল। তার আইডিতে ঢুকে চোখে পড়লো সেই একই কথা, ‘এত আগেই মরে গেলাম?’

মনে পড়লো মরভূম দাদির কথা। একশত বছরের উপর জীবন পেয়েছিলেন তিনি। তার আইডিতে হয়তো ভিন্ন কিছু থাকতে পারে এই আশায় সেখানেও টুঁ মারলো সে। কিন্তু না, এখানেও একই

সে। কিন্তু না, এখানেও একই
জিনিস, ‘এত তাড়াতাড়িই চলে
এলাম!’

মনটাই খারাপ হয়ে গেল তার।
শতবছর পার করেও তাড়াতাড়ি!
অথচ এই বয়স নিয়েই তো দাদি
তার বৃদ্ধবয়সে কত গর্ব করতেন।
বের হওয়ার আগে আরেকবার

নিজের নিউজফিড রিফ্রেশ দিলো
সে। সেকেন্ডে সেকেন্ডে আপডেট
হচ্ছে নিউজফিড, নানান দেশের
জানা-অজানা শত সহস্র মানুষের
পোস্ট; নানান ভাষায় সেই একই
লেখা।

হঠাতে একটা স্ট্যাটোসে চোখ আটকে
গেলো তার। সেখানে লেখা,

‘আলহামদুল্লাহ, মাত্র দেড় মাসেই
মুক্তি।’ কৌতূহলবশত প্রোফাইল
ঘেঁটে দেখতে পেলো, মাত্রই
নিউমোনিয়ায় মারা গেলো দেড়
মাসের শিশুটি। আর তার নামের
পাশে সোনালি অক্ষরে
লেখা-জারাতি (VERIFIED)।

আম-মলাতু খাইরুম মিনান নাওম

- শাহনাজ খুশী



বাইরে ঝিরিবিরি বৃষ্টি পড়ছে।

সকালের কাঠফাঁটা রোদের পরে দুপুরে
এমন বৃষ্টি খুবই ভালো লাগে আসিয়ার।
জানালা দিয়ে হাত বের করে আকাশের
দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে।
হঠাৎ-ই মনে পড়ে গেল পুরোনো কিছু
সূতি। এমনই এক বৃষ্টিভেজা দিনে তার
বান্ধবী আফিফার কাছ থেকে সে প্রথম
বৃষ্টির সময়ের দু'আটি শিখেছিলো। বৃষ্টির
সময়ে দু'আ করুল হয় জেনে সব
বান্ধবীরা স্কুলে একসাথে মিলে দু'আ
করেছিলো সেদিন। কী সুন্দরই না ছিলো
দিনগুলো।

‘আসিয়া!...’

ভাবনায় ছেদ পড়লো মায়ের ডাকে।
খাবার খেতে ডাকছেন। সবাই একসাথে
খেতে বসল। ‘ডালে লবণ কম হয়েছে’
বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। কেননা

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও খাবারের দোষ-
ক্রটি বর্ণনা করতেন না। পছন্দ হলে
খেতেন, পছন্দ না হলে রেখে দিতেন।

খাওয়া শেষে ফোন নিয়ে বসল আসিয়া।
ইদানীং সে ইউটিউবে একটি কুরআন
শিক্ষার কোর্স করছে। ভিডিও দেখছে,
এমন সময় তার ছেট ভাই আদনান
টিভিতে গান ছেড়ে দিলো। অনেকবার
বলার পরেও বন্ধ না করায় বাধ্য হয়ে
তাকে অন্য রুমে যেতে হলো। ভাইকে
সে অনেকবার বুঝানোর চেষ্টা করেছে।
কিন্তু তাতে তেমন কোনো লাভ হয়নি।
এরই মাঝে হঠাৎ এসাইনমেন্ট এর কথা
মনে পড়লো। পরশু দিন জমা দেওয়ার
লাস্ট ডেট। একটা টপিকে যেয়ে সে
আটকে গেল। হঠাৎ তার মনে হল
আফিয়া বিষয়টা বেশ ভালোভাবে ক্লিয়ার
করে দিতে পারবে। যেই ভাবা সেই

কাজ। সোজা চলে গেল আফিয়ার বাসায়। ফিরতে ফিরতে প্রায় বিকেল। আন্টি না খেয়ে আসতেই দিলো না। ফেরার সময় তার ভাইকে দেখল, একটি মেয়ের সাথে রিকশায়। নিজের চোখকেই বিশ্বাসই করতে পারছিল না সে। ঘোর কেটে গেলে সে মনে মনে ভাবল, বাসায় যেয়ে ওর সাথে কথা বলা দরকার। এভাবে তো তাকে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

মাগরিবের সালাত পড়া শেষ। জায়নামাজ ভাঁজ করতে করতে দেখলো আদনান বাসায় ঢুকছে।

- আসসালামু আলাইকুম।
- ওয়া আলাইকুমুস সালাম।
- সালাত পড়েছিস?
- না।

আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই নিজের রূমে ঢুকে দরজা লক করে দিল আদনান। আসিয়া বুরতে পারলো যে, এখন ওর সাথে কথা বলে লাভ নেই। আরেকটু পরে বলা যাক।

ঘন্টা খানেক পর আসিয়া সিদ্ধান্ত নিল, এখন আদনানের সাথে কথা বলতে যাবে। কোনো রকম রাগারাগি না করে রাস্তালাহ যেমন ছোটদের উপর্যুক্ত দিতেন ঠিক সেভাবেই আসিয়া আদনানকে বুরোবে বলে মনে মনে ঠিক করল। ভাইয়ের রূমে ঢুকেই দেখতে পেল সে ফোন নিয়ে ব্যস্ত। পাশে গিয়ে বসতেই আদনান বলল,

- কিছু বলবা?
- হ্ম, তোকে আজ একটা মেয়ের সাথে দেখলাম। কে ছিল ও?
- ওহ, তেমন কিছু না, ফ্রেন্ড।
- ভাই, বাদ দে এসব।
- কী করেছি?
- শোন, ইসলাম ছেলেমেয়ের এমন বন্ধুত্ব সমর্থন করে না।
- যাও তো। ভাল্লাগচ্ছে না, প্লিজ যাও।
- একটু শুনবি তো?

বিরক্ত হয়ে অন্যরুমে চলে গেল আদনান।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। রাত তখন ২ টা ৪৮ মিনিট। আদনানের চোখে ঘুম নেই। অবশ্য এটা নতুন কিছু না। সে এমনিতেই রাত ২/৩ টায় ঘুমায়। কিন্তু সে রাতে তার কেমন যেন অস্তির লাগছে। ফোন হাতে নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ইউটিউব ব্রাউজ করা শুরু করলো। হঠাৎই একটি ভিডিও চোখে পড়লো। টাইটেল—‘সবচেয়ে সেরা কঢ়ে সূরা মূলক।’ এমন অনেক ভিডিওই মাঝে মাঝে চোখে পড়ে তার, কিন্তু কখনও দেখা হয় না। কি ভেবে যেন ভিডিওটিতে ক্লিক করলো সে।

- আহ, প্রশান্তি!
- এতক্ষণ এটাই তো খুঁজছিল সে। কুরআন

তিলাওয়াত এত সুন্দর হয়?
চোখ বন্ধ করে শুনছে আর
শান্তিতে মন ভরে যাচ্ছে।
একবার শোনার পর অর্থসহ
আরেকবার দেখল। বারবার
শুনতে ইচ্ছে করছে। এমন
করতে করতে ৪-৫ বার
শোনা হয়ে গেল। এরপর
কারীর নাম সার্ট দিয়ে তাঁর
আরো তিলাওয়াত সে শুনতে
লাগল। হঠাৎ-ই যেন
কুরআনের প্রতি তার
ভালোবাসা বেড়ে গেল।

ফজরের আযান হচ্ছে। ফোন
রেখে আযান শুনছে
আদনান। আযান শোনার
সময় একটা জিনিস খেয়াল
করল, মুয়াজ্জিন একটি বাক্য
বেশি বলছেন, ‘আস-সলাতু
খইরুম মিনান নাওম।’ এর
আগে তো কখনো এটা
শুনেনি। তাহলে কি ফজরের
আযানেই শুধু এটি বলা হয়?
কিন্তু এর অর্থ কী? একটু
গুগল করেই সে জানতে
পারলো এর অর্থ হচ্ছে ‘যুম
হতে সালাত উত্তম।’ এতক্ষণ
আদনান ভাবছিল যে, আযান
শেষ হলে ঘুমুতে যাবে। কিন্তু
এই বাক্যটির অর্থ জানার
পর কেন জানি আজ খুব
ইচ্ছে করছে মাসজিদে গিয়ে
সালাত আদায় করতে।

বারান্দা থেকে দেখা
যাচ্ছে, ত্রি যে কিছু মানুষ
মাসজিদের উদ্দেশ্যে
হাঁটছে। আদনানও কি
পারে না তাদের দলে
অন্তর্ভুক্ত হতে? অবশ্যই
পারে।

আসিয়া প্রতিদিনের মত
আজও উঠে ওয়ু করতে
যাচ্ছে ওয়াশরংমের দিকে।
তখনই দেখল, কেউ
একজন টুপি মাথায় দরজা
দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।
একি! এ তো আদনান!
সালাতের জন্য মাসজিদে
যাচ্ছে। সে কি স্বপ্ন
দেখছে? উহু, এটা স্বপ্ন
নয়। পুরোটাই বাস্তব।

লেখিকা: শিক্ষার্থী, অষ্টম শ্রেণী,
কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ।

ফজরের
আযান হচ্ছে।
ফোন রেখে
আযান শুনছে
আদনান।
আযান শোনার
সময় একটা
জিনিস খেয়াল
করল,
মুয়াজ্জিন
একটি বাক্য
বেশি বলছেন,
‘আস-সলাতু
খইরুম মিনান
নাওম,’



তে প্রোগ্রামিং,
তে পাইথন

দ্বিতীয় পর্ব

আজমাইন ফায়েক থামিয়ে

ডাবল কোটেশন তুলে দিয়ে Hello World প্রিন্ট করলে কি ঠিক নিচের মত কোনো Error আসে?

```
>>> print(Hello World)
      File "<input>", line 1
          print(Hello World)
                      ^
SyntaxError: invalid syntax
```

এখানে SyntaxError আসার প্রধান কারণ স্ট্রিং ও ইন্টিজারতত্ত্ব! ব্যপারটি চলো বুঝো নেওয়া যাক-

চলক বা variable সম্পর্কে আমরা টুকটাক সবাই-ই কম বেশি জানি। যেমন মনে করি, x যেকোনো একটি ভ্যারিয়েবল। এর যেকোনো ভ্যালু কিন্তু থাকতে পারেঃ -1, 0, 55, “a” ইত্যাদি। এক্ষেত্রে চলকের ভ্যালুর প্রকারই হলো ইন্টিজার, ফ্লোট কিংবা স্ট্রিং। চলো হাতে কলমে দেখে নেওয়া যাক বিষয়টিঃ

```
>>> x = 5 #integer
>>> x = 0.1 #float
>>> x = "ab" #string
```

“#” দিয়ে কোনো বাক্য শুরু হলে তা কিন্তু কমেন্ট হিসেবে ধরা হয়। অর্থাৎ আমরা যেকোনো কিছু যেসব নির্দেশক দিয়ে বুঝিয়ে থাকি।

ডাবল কোটেশনের মধ্যে যা থাকে সেইটা স্ট্রিং হিসেবে থাকে। আর যদি কোনো সাধারণ সংখ্যা থাকে তাহলে সেটি ইন্টিজার আর যদি কোনো দশমিক থাকে ভ্যারিয়েবল (যেমনঃ x) এর মান যেমন 0.1 তাহলে সেটার টাইপ হবে ফ্লোট!

এখন চলো আমরা ইন্টিজার ও ফ্লোটের যোগ-বিয়োগ শিখিঃ

```
>>> x=7
>>> y=9
>>> print(x+y)
16
>>> print(x-y)
-2
```

তোমার কাজ হবে দুইটি স্ট্রিং যোগ করে প্রিন্ট করা এবং বিয়োগ করলে কোন Error আসে
কিনা সেটা নিজে নিজে চেক করা

স্ট্রিং নিয়ে কাজ-কারবার

শুধু পড়ে গেলেই কিন্তু চলবে না, তোমাদেরও নিজ হাতে কোড করা লাগবে। আমরা `s = "I love prophet Muhammad(pbuH)"` লিখি সবাই কম্পাইলারে। এখন বলো তো, এখানে “o” কয়টা আছে? তুমি কি হাত দিয়ে গোণা শুরু করেছ? পাইথনে কিন্তু এর জন্য একটা ফাংশন আছে `count()`। চলো দেখে নেওয়া যাক-

```
>>> s = "I love prophet Muhammad(pbuH)"
>>> s.count("o")
2
```

আচ্ছা বলো তো দেখি, `s.count("k")` লিখলে কি আসে?

পুরো `s` এ ঠিক কতটি এলিমেন্ট আছে কেউ জিজ্ঞেস করলে কি আবার গোণা শুরু করবে?
অবশ্যই করবে না যদি তুমি কোডিং পারো।

```
>>> len(s)
29
```

এখানে কিন্তু স্পেইস, ভাকেট এইগুলোও অন্তর্ভুক্ত।

তোমাদের জন্য কিছু বাসার কাজঃ

- দুটি ইন্টিজার গুণ এবং ভাগ কর
- “1” ও “99” যোগ করলে আউটপুট কি আসে? এটা কেন আসে বলতে পারবে?
- `S = "We are Sholo fans! Dhsvbvxzn bjxcjzkBCJ"` মোট কতটি “a” এবং
“j” আছে তার যোগফল `count` মেথডের মাধ্যমে বের করো।

প্রোগ্রামিং শেখার সময় মনে রাখবে যে, “কেন হয়” এর থেকে “করলে কি হয়” সেটা জানাই
বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর হ্যাঁ, নিজেদের মনে কোনো প্রশ্ন আসলে তা অবশ্যই কোড করে রান করে
দেখতে ভুলো না কিন্তু।

চলবে ইনশা আল্লাহ...